পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে



গ্রন্থকারের নিবেদন

'রক্তকরবী' নাটকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি অভিনব জীবন-দ্বন্দ্বের অপূর্ব রস-রূপ দান করিয়াছেন। এই নাটককে আমার পূর্বসূরীরা বিভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে আমার মনে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে এবং নাটকটিকে পূর্ণ স্বরূপে দেখিবার যে প্রেরণা অনুভব করিয়াছি, তাহাতে আমার এই গ্রন্থের মূলে তাঁহাদের দান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করি।

'রক্তকরবী' নাটক মনোজীবনের নাটক। ইহার শিল্প-ভঙ্গী গতানুগতিক নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী এখনও স্বীকৃত হয় নাই এবং আমাদের রসিক চিত্ত ইহার নাট্য-ভঙ্গীকে এখনও জীবনোপলব্ধির সহিত মিলাইয়া লইতে পারে নাই। আমাদের জীবনে একটি অন্তর্নাট্যের ভূমিকা রহিয়াছে; কবিগুরু তাঁহার দিব্য-দৃষ্টি দিয়া তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের জীবনোপলব্ধিতে এই অন্তর্নাট্যের লীলা যখন ধরা পড়িবে, তখনই এই শ্রেণীর নাটক আমাদের রসাস্বাদনের বিষয় হইয়া উঠিবে। 'রক্তকরবী' নাটক সেই ভাবীকালের নাটক। ইহাতে আমাদেরই জীবন-দ্বন্দ্বের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা বলা হইয়াছে। তাহা অবাস্তব নহে, তাহা কবির কোন Fantacy নহে; তাহা হইল দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন কবি-কল্পনা, যাহা বর্তমানের মধ্যে জীবনের ভাবীকালের প্রকাশকে আবিষ্কার করে, নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বী যে কবি-কল্পনার 'সহৃদয় সামাজিক'।

এই অন্তর্নাট্যের দিক হইতে দেখিলে 'রক্তকরবী' নাটকে মানব-মানবীর জীবন-লীলার রস-রূপটি ধরা পড়িবে। সুধী সমাজের কাছে 'রক্তকরবী'র সেই পরিচয়টি আমি উপস্থিত করিতে চাহিয়াছি। কিন্তু সমালোচনা করিতে গিয়া বারবার বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে। আমাদের যে স্থূলবুদ্ধি ও জড় চেতনা বর্তমান কালের অধীন, তাহাই ভাবীকালের দিকে আমার দৃষ্টিকে বারবার আচ্ছন্ন করিয়াছে। 'রক্তকরবী'র অধ্যাপকের মতন আমিও আমার আধুনিকতার জালে আবৃত। কিন্তু তাহারই ফাঁক হইতে কবির নাট্য-কাব্যের বিদ্যুৎ-চমক মাঝে মাঝে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন 'পুঁথিপত্র' ফেলিয়া 'চরম-

প্রাণের' সন্ধান লইতে আমার চিত্ত উন্মুখ হইয়াছে। এই চিত্তোন্মুখতাই নাট্য-সমালোচনায় আমার ভাষা জোগাইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, এই শ্রেণীর নাট্য-সমালোচনাকে Objective না করিয়া Subjective করিয়া তোলাই সমীচীন; এই শ্রেণীর নাটকের আলোচনায় বিশ্লেষণপন্থা অপেক্ষা সংশ্লেষণপন্থা শ্রেয় কিনা বিদগ্ধসমাজ-ই বিচার করিবেন।

অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি 'রক্ত-করবী'র পাঠ প্রথম গ্রহণ করি; অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত রূপক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি; এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিতে সম্মত হইয়া আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার গ্রন্থ সম্বন্ধে যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কলেজের বাংলা সেমিনারে গ্রন্থের অংশবিশেষ লইয়া আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থের কতকাংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন শ্রীমতী বীণা চট্টোপাধ্যায়; প্রুফ দেখার বিরক্তিকর কাজটি প্রসন্নতার সহিত করিয়া দিয়াছেন আমার দুই বন্ধু শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রীসত্যব্রত ঘোষ; প্রচ্ছদপটটি আঁকিয়া দিয়াছেন আমার বাল্যবন্ধু শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি ঋণী। পরিশেষে 'নাভানা'র কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন ও তৎপরতার সহিত এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যে যে সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

'হরিধাম'
আখন বাজার
চুঁচুড়া
৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

[সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় এম, এ, পুরাণরত্ন, সাহিত্যবিশারদ মহাশয় লিখিত]

শ্রীমান্ তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কবিগুরুর রক্তকরবী' গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। এ পর্যন্ত 'রক্তকরবী' লইয়া এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। 'রক্তকরবী' আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখক বিস্তর তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। সহজ, স্বচ্ছ অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কখনও কখনও সংশ্লেষণী আলোচনপদ্ধতি অবলম্বনে আশ্চর্য ভাবুকতা ও মনস্বিতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গগুলি পড়িতে পড়িতে বারবার এই কথাই আমার মনে হইয়াছে, তপনকুমার শুধু ভাবেন না, ভাবাইতে পারেন, শুধু বলেন না, বলাইতে জানেন। প্রবন্ধগুলিতে কবির যত্ন ও সাধকের নিষ্ঠা আমি লক্ষ্য করিয়াছি ; লক্ষ্য করিয়াছি এমন একটি স্বপ্নপ্রসন্ন ন্যায়নিষ্ঠ মন—রবীন্দ্রভাবোদ্ভাসিত প্রেমস্বভাবের আনন্দে ফুলের মত যাহা ফুল্লোদ্দীপ্ত। কবিগুরুর নাট্যব্যাখ্যার জন্য যে সহজ ভাব, সাবলীল ভাষা, সরল পাণ্ডিত্য ও অনাড়ম্বর রচনাভঙ্গী প্রয়োজন—এ-যুগের সমালোচকদের অনেকের মধ্যেই তাহা দেখি না। সমালোচক তপনকুমারের সাধনায় পুরাপুরিভাবে তাহা আছে—এটি স্বীকার করিতে পারিয়া গব অনুভব করিতেছি।

'কবিগুরুর রক্তকরবী' বিদগ্ধসমাজ সাদরে গ্রহণ করিবেন, অভ্যর্থনা করিবেন বলিয়াই আমার আশা। আমার ধারণা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের আলোচনা কী ভাবে এবং কেমন করিয়া করিতে হয় তপনকুমারের গ্রন্থ হইতে ভাবীকালের সমালোচক-

বৃন্দ তাহার নির্দেশ ও উপদেশ পাইবেন। এই হিসাবে তাঁহার সমালোচনপ্রবন্ধ বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে।

আশুতোষ কলেজ
কলিকাতা-২৫

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
৯।২।১৯৫৩

প্রথম অধ্যায়

ভাব-বস্তু

আমাদের জীবনযাপনের দীনতায় আমাদের জীবন আমাদের অগোচরে ক্রমশঃই একটা বিকৃতি লাভ করে। আমরা জীবনকে যে ভাবে গড়িয়া তুলি তাহা প্রায়ই সহজের পথ ছাড়িয়া জটিল হইয়া পড়ে। সহজ জীবন বলিতে হয়তো এককালে আমরা কিছু বুঝিতাম, কিন্তু জীবনকে গড়িতে গড়িতে আমরা এমন একটা রূপের কথা ভাবি, এমন একটা পথ ধরিয়া চলি যাহাতে সেই সহজ জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া যাই। এই জটিলতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিশেষ একটা কিছু হইয়া উঠিতে মানুষের যেন একটা গৌরব আছে। 'আমি সহজ নহি, আমি বিশেষ একটা কিছু' এ কথা মানুষই বলিতে পারে। ইহাতে তাহার মানবতার একটা বোধ জন্মায়। এই বিশিষ্টতা অর্জন করাকে সে বড়ো হওয়া বলিয়া মনে করে।

এই বিশিষ্টতা লাভ করা, এই বড়ো হওয়াই মানুষের ধর্ম। আপনার স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই মানুষ বড়ো হইয়া উঠে। এই স্বভাব সহজ হইতে জটিলতার দিকে, সাধারণ হইতে বিশিষ্টতার দিকে। এই স্বভাব মানুষকে একটা পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া যায়, তাহাকে একটা মহিমা দান করে।

কিন্তু এই মহিমার পথে চলিতে গিয়া আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিকতার পথে চলি। আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার একটা বিকৃত বোধ জন্মায়। তাহার দিকে চলিতে গিয়া আমরা সহজ জীবনের পথ হইতে বিচ্যুত হই। এই যে বিকৃত পরিপূর্ণতা, ইহাও সাধনায় লভ্য; কিন্তু সে সাধনা ভ্রান্তির পথে। অনেক সময় সাধনার কঠোরতার জন্যই বিকৃতিকে অধিকতর সত্য, অধিকতর পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় এবং আমাদের যে মানবধর্ম সাধনার জন্য লালায়িত, সে সেই বিকৃতির পথকেই একান্ত করিয়া বসে।

আমরা যখন জীবনের রূপায়ণে এই বিকৃতির মধ্যেই থাকি, তখন বিকৃতিকে বিকৃতি বলিয়া বুঝিতে পারি না, ইহাকেই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পরিপূর্ণতার বোধ যখন আমাদের কাছে বিকৃত, তখন তাহারই সাধনায় যে মানবধর্ম অনুভব করি, সেই মানবধর্মও বিকৃত। অথচ এই বিকৃতির বোধ আমাদের নাই। ইহাই আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি।

এই সহজ জীবন ও তাহা হইতে বিচ্যুতি বলিতে কি বুঝি তাহা আর

একটু স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখা যাক। সহজ জীবন বলিতে সেই জীবন বুঝায় যাহা প্রকাশের সময় পরিপার্শ্বের সহিত একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর ও সত্যকে প্রকাশ করে, যাহা আপনার অতিরিক্ততায় কাহাকেও আচ্ছন্ন করে না অথবা আপনার অকিঞ্চনতায় কাহারও দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না। তাহা স্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় এবং জীবন-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিলে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বে কাহারও সহিত এই পরিপূর্ণতার বিরোধ থাকে না। এক কথায়, সহজ জীবন বলিতে জীবনের একটি স্বাভাবিক, মুক্ত ও পরিপূর্ণ রূপ বুঝি। জীবন যে পরিমাণে সহজ জীবন হইতে বিচ্যুত হয়, সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক, বদ্ধ ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে।

কিন্তু এখনও সহজ জীবনের সংজ্ঞা সহজ হইল না। জীবনের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, বদ্ধ-মুক্ত প্রভৃতি কথাগুলি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইবে।

জীবন সম্বন্ধে যখন আমরা উপরোক্ত কথাগুলি ব্যবহার করি, তখন আমরা পরোক্ষভাবে জীবনের একটি চরম লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকি। জীবনের চরম লক্ষ্য জীবনেরই পরিপূর্ণ বিকাশ। এই পরিপূর্ণতার দিকে জীবন চলিয়াছে। ইহারই ভূমিকায় আমরা জীবনকে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া থাকি। জীবনের এই চরম লক্ষ্য, জীবনের এই পরিপূর্ণতা একটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্য সকলের নিকট যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আবার দেশ ও কাল হিসাবে জীবনের সত্য অনেক সময়েই বিভিন্ন রূপ লাভ করে। সত্যের যেখানে বিভিন্নতা সেখানে সত্যগুলি খণ্ডিত এবং বিরোধে পূর্ণ; কারণ পূর্ণের সহিত পূর্ণের কোন বিরোধ নাই, খণ্ডের সহিতই খণ্ডের বিরোধ, জীবনের সকল খণ্ডসত্যগুলি এক পূর্ণসত্যের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত—সত্যদর্শী ঋষিরা এই কথা বলিয়া থাকেন। এই পূর্ণসত্যের তত্ত্ব-কথার এখানে অবতারণা করিব না। ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলিয়াও ইহার ধর্ম সম্বন্ধে এই ক'টি কথা বলা যায় যে, এই পূর্ণসত্য সকল জীবনের পক্ষে সত্য এবং তাহা দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এই যে সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্য, ইহা একম্, ইহা অদ্বিতীয়ম্।

এই সত্য-সমুদ্রের দিকে জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জীবনকে মুক্ত ও স্বাভাবিক বলিয়া থাকি। জীবনের স্বভাব সত্যের দিকে চলা; জীবনের মুক্তি এই চলার গতিকে অপ্রতিহত রাখাতে।

জীবনের রূপায়ণে এই সত্যকে যখন বিস্মৃত হইয়া থাকি, তখন জীবন সম্বন্ধে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, বদ্ধ, মুক্ত প্রভৃতি কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারি না। সেগুলি একটি কথার কথা হইয়া পড়ে মাত্র। কিন্তু যখন সত্যের প্রতি সচেতন হই, যখন তাহারই দিকে জীবন-প্রবাহকে চালিত করি তখনই স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা, বদ্ধতা ও মুক্তির পার্থক্য ধরা পড়ে। যখন দেখি যে সত্যের দিকে জীবন-স্রোত বহিতেছে না, জীবন ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিতেছে, তখনই জীবনকে অস্বাভাবিক বলিয়া বুঝি; যখন দেখি সত্যের দিকে চলিতে গিয়া জীবনের গতি রোধ হইয়া যাইতেছে, তখনই জীবনকে বদ্ধ বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ অন্তে একটি লক্ষ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে তবেই স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবনের বোধ জন্মায়। এই লক্ষ্যের কথা বাদ দিলে স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

এই লক্ষ্যটিকে যদি এক পরিপূর্ণ সত্য বলা যায়, যাহা সর্বকালীন এবং সর্বজনীন, যাহা একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্, তাহা হইলে সেই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের একটা স্বাভাবিক ও মুক্ত রূপ নির্দেশ করা যায়। যাঁহারা সেই এক-কে, সেই অদ্বিতীয়কে জীবনে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই জীবনের তত্ত্ব ও নীতি দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সত্য যদি চেতনায় উদ্ভাসিত না হইয়া উঠে তবে শুধুমাত্র নীতি ও তত্ত্বের অনুসরণে সত্য লাভ হয় না। এখন, সত্যের বোধ বিভিন্ন চেতনায় বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সত্য হয়তো মূলে একই থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের বোধটি আপেক্ষিক। অনেকে বলিতে পারেন, যুগে যুগে সত্যকে বদলাইতে দেখা গিয়াছে, যাহা পূর্বের যুগে সত্য ছিল, পরের যুগে তাহা আর সত্য নাই। কথাটি ঠিক নয়; সত্য বদলাইতে পারে না। যদি বদলাইয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহা সত্য ছিল না, তাহা মিথ্যা। সত্য এক, সত্য চিরন্তন; কিন্তু সত্য-বোধটি আপেক্ষিক। তাহা দেশে ও কালে বিভিন্নতা লাভ করে। সত্য-বোধের আপেক্ষিকতায় আমাদের জীবনের তত্ত্বগুলিও আপেক্ষিক হইয়া উঠে। সত্য চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়; কিন্তু সত্য-বোধটি আপেক্ষিক। এই সত্য-বোধের ভূমিকায় জীবন সম্বন্ধে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, বদ্ধ, মুক্ত প্রভৃতি কথাগুলিও আপেক্ষিক।

সত্য-বোধ আপেক্ষিক, অর্থাৎ সত্যের উপলব্ধিতে তারতম্য আছে। এই তারতম্যের জন্য একই সত্য বিভিন্ন রূপ লাভ করে এবং পরিশেষে বোধের

দীনতায় খণ্ডিত হইয়া যায়। সত্যকে যখন ছোট করি তখন জীবনকেও সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি। আবার সত্যকে যখন বিকৃত করি, অথবা যাহা সত্য নয় তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করি, তখন জীবনকে ভুল পথে চালিত করি; তখনই সহজ জীবন হইতে বিচ্যুত হই। জীবন তখন অস্বাভাবিক ও বদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে স্বাভাবিক, মুক্ত ইত্যাদি কথাগুলি আপেক্ষিক। অর্থাৎ মিথ্যাকেই যখন সত্য বলিয়া জানি, তখন সেই মিথ্যার জীবনকেই স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবন বলিয়া বোধ হয়। যথার্থ সত্যের বোধ জন্মিলে এই মিথ্যা-স্বাভাবিকতা, মিথ্যা-মুক্তির বোধ চলিয়া যায়।

আমাদের জীবনে এই সত্যের বোধ কিরূপে জন্মে? আমরা যাহারা সাধারণ ভাবে গতানুগতিক জীবন যাপন করি, সেই আমাদের জীবনে সত্য-মিথ্যা নিরূপণের অবকাশ কোথায়?

আমাদের জীবনে সে সুযোগ রহিয়াছে। সমাজজীবনের মধ্যে আমরা জীবনের একটি সত্য-রূপ দেখিতে পাই এবং তাহারই মানদণ্ডে আমরা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি। আমাদের সমাজ-জীবনে যে একটি সত্য-রূপ প্রতিফলিত হয় তাহা আমাদের কাছে তুচ্ছ নয়। কারণ, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের মানুষ রহিয়াছে; বিভিন্ন চেতনায় উদ্ভাসিত বিভিন্ন সত্যের একটা সম্মিলিত রূপ সেখানে পাওয়া যায়। জীবনের অনেক নির্দেশ আমরা সমাজ-জীবনের সত্য হইতে লাভ করি। এমন কি অনেকক্ষেত্রে হয়তো পুরাপুরি সামাজিক হইয়া উঠিতে পারাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

সমাজ জীবনের সত্য যদি বিকৃত না হয়, যদি তাহা পরিপূর্ণতাকে স্বরূপে প্রকাশ করে, তবে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে সামাজিক হইয়া উঠাই হয়তো তাহার জীবনের চরিতার্থতা। কিন্তু যেখানে সমাজজীবনে সত্যের রূপ বিকৃত, সেখানে ব্যক্তির পক্ষে সমাজজীবন যথেষ্ট নয়। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে সত্য-নিরূপণের উপায়টি কি? কিসের ইঙ্গিতে ব্যক্তি তাহার জীবনের সত্যটিকে ধরিতে পারে, কি উপায়ে তাহার সত্যের বোধ জন্মে?

জীবনের সত্য বলিতে যদি জীবনের চরম বিকাশের লক্ষ্যকে বুঝি, তাহা হইলে জীবনের প্রকাশের তত্ত্ব হইতে এই সত্যটিকে বুঝিতে হইবে। জীবনের প্রকাশের মূল তত্ত্বটি কি? তাহা হইল আনন্দ-তত্ত্ব। এই আনন্দ-তত্ত্বের ভূমিকায় জীবন-সত্যের প্রতিষ্ঠা। জীবনের ধর্ম হইল আপনাকে প্রকাশ করা। এই প্রকাশেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। জীবনের প্রকাশ আর আনন্দের প্রতিষ্ঠা

একই কথা। আনন্দকে জীবন হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিবার উপায় নাই। জীবনকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই জীবনের আনন্দকেও স্বীকার করিতে হইবে। জীবন বলিতে যদি একটি চৈতন্যময় সত্তা বুঝি, তবে আনন্দ বলিতে বুঝিব, স্বীয় চৈতন্যে সেই সত্তার আপনাকে উপলব্ধি করিবার অবস্থা। সত্তার চৈতন্য তাহাকে বলি, যাহার দ্বারা সত্তা আপনার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির অবস্থাকে বলে আনন্দ এবং উপলব্ধির ক্রিয়াকে বলে প্রকাশ। সত্তা যদি চৈতন্যময় হয়, তবে সে আপনাকে আপনি উপলব্ধি না করিয়া পারে না। ইহাই তাহার ধর্ম্ম। তাই জীবন ও আনন্দ এই কথা দুইটি একই সঙ্গে সম্পৃক্ত, ইহাদিগকে আমরা পৃথক করিয়া ভাবিতে পারি না। জড় বস্তুর সম্বন্ধে আমরা আনন্দের কথা চিন্তা করি না। জড় বস্তুও একটি সত্তা; কিন্তু তাহা চৈতন্যময় নহে অথবা তাহাতে চৈতন্য থাকিলেও সে চৈতন্যের রূপ অতি প্রচ্ছন্ন, আমাদের বোধের অতীত। কিন্তু আনন্দ আছে অথচ জীবন নাই, এ কথা আমরা ভাবিতে পারি না। জীবন আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে আনন্দ হইয়া বিলসিত।

এই আনন্দ সব সময়েই অকৃত্রিম। কৃত্রিম আনন্দ বলিয়া কোন কথা নাই। আনন্দের রূপ যেমনই হউক না কেন, তাহা সব সময়েই অকৃত্রিম। আনন্দ আপনার স্বভাবে আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, চেষ্টা করিয়া কোন নকল আনন্দ তৈয়ারী করা যায় না। আমি আনন্দ পাইতেছি, এ কথা মিথ্যা করিয়া বলিবার উপায় নাই। মিথ্যা-আনন্দ বলিয়া কোন বিষয় নাই। যদি কেহ বলে যে আমি আনন্দ পাইতেছি, তবে সে আনন্দের রূপ যেমনই হউক না কেন, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার একটা বোধ ঘটিয়াছে, যে-বোধটি সত্য। তাহার কোন সত্যের বোধ না হইতে পারে, কিন্তু তাহার বোধটি সত্য।

এখন, আনন্দের বোধ সব সময় অকৃত্রিম, অর্থাৎ সত্য। কিন্তু আনন্দ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিচার করা যাইতে পারে, তাহা হইল স্থায়ী ও অস্থায়ী, সংকীর্ণ ও ব্যাপক, অশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ প্রভৃতির বিচার। অর্থাৎ quality, quantity এবং duration,—গুণ, পরিমাণ ও স্থায়িত্বের বিচার। আনন্দের ধর্মগুলি যখন positive, অর্থাৎ আনন্দ যখন স্থায়ী, ব্যাপক এবং বিশুদ্ধ, তখন তাহার ভূমিকায় জীবনের প্রকাশও পরিপূর্ণ। যখন আনন্দের ধর্মগুলি ইহার বিপরীত, তখন জীবনের প্রকাশও খণ্ডিত।

আমাদের জীবন প্রকাশের দ্বারা কোন-না-কোন ভাবে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া

চলিয়াছে। আনন্দের negative ধর্মগুলি জীবনের প্রকাশকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ করিয়া আনে। ইহাতে জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে। কিন্তু জীবনের ধর্ম আপনার অস্তিত্বকে বজায় রাখা। জীবনের এই ধর্মই আনন্দের positive ধর্মগুলিকে মুখ্য করিয়া তোলে। আনন্দের positive ধর্মগুলি জীবনের প্রকাশকে রুদ্ধ করে না ; ইহা জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে, তথা লক্ষ্যের দিকে, তথা সত্যের দিকে প্রকাশ করে। আমরা যখন আনন্দের negative ধর্মগুলি লইয়া থাকি, তখন আমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি না, অন্য অর্থে তখন যাহাকে সত্য বলিয়া ভাবি তাহা খণ্ডিত সত্য, তাহা কোন বৃহত্তর সত্য নহে। আনন্দের positive ধর্মগুলির প্রতি যখন আমরা সচেতন হই, তখন তাহারই ভূমিকায় আমাদের নিকট সত্য স্বরূপে ধরা পড়ে। জীবনের সত্যকে এই আনন্দের মাধ্যমে লাভ করি।

আনন্দ যখন বিশুদ্ধ, ব্যাপক এবং স্থায়ী, তখন সেই আনন্দের ভূমিকায় যে জীবন যাপন করি, তাহাই হইল সহজ জীবন। এই জীবনে সত্যের একটা স্বরূপ জাগিয়া উঠে। বলাই বাহুল্য, এই জীবন স্বাভাবিক এবং মুক্ত।

যাঁহারা মহান্, তাঁহারা এই বিশুদ্ধ, ব্যাপক এবং স্থায়ী আনন্দের পথে সহজ জীবনের সাধনা করেন ও অমরত্ব লাভ করেন। তাঁহারা সত্যের মধ্যে মুক্তি পান। আমরা যাহারা অশুদ্ধ, সংকীর্ণ এবং অস্থায়ী আনন্দের পথে চলি, আমরা জটিল ও বিকৃত জীবনের সাধনা করি ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমরা মিথ্যার মধ্যে বদ্ধ থাকি। আমাদের মধ্যে যদি এই মৃত্যুর বোধ জাগিয়া উঠে, যদি আমাদের ধ্বংস সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই, তবে এই জটিল ও বিকৃত জীবন হইতে আমরা আবার সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের দিকে ফিরিবার জন্য সাধনা সুরু করিতে পারি।

এই সাধনা কিরূপে সুরু হইতে পারে, রক্তকরবী নাটকে কবিগুরু তাহাই দেখাইয়াছেন।

'রক্তকরবী'র ভাববস্তুর যে পরিচয় উপরে দিলাম, ইহার সহিত হয়তো অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে। সে দিক দিয়া রক্তকরবী নাটকের

প্রসঙ্গে সহজ জীবন ও আনন্দতত্ত্বের এই দার্শনিক ভূমিকাও হয়তো অবান্তর এবং বাহুল্য। রক্তকরবী নাটকের ভাববস্তুকে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে পারেন। কোন একটি পথ অনুসরণ করিয়া যদি কাহারও রসের সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তিনি যে ভুল করিলেন সে কথা স্পর্ধা করিয়া বলা চলে না। কারণ, রসাস্বাদন হইলে তখন আর কোন তর্ক চলে না। রসাস্বাদনে একটি বিশ্বাস জন্মিয়া যায় যাহা সকল প্রকার তর্কের অতীত। কিন্তু কেহ যদি কোন একটি পথ অনুসরণ করিয়া রসের সাক্ষাৎ না পান, তাহা হইলে তিনি যে ভুল করিতেছেন, সে কথা বলিবার অবকাশ থাকে। এখানে আমি সে অবকাশ রচনা করিয়া লইতে চাহি না। রক্তকরবী নাটক হইতে আমি যে রস আস্বাদন করিয়াছি এখানে তাহাই নিবেদন করিতে চাই। আলোচ্য বিষয়ে আনন্দতত্ত্বের ভূমিকা তাই অবান্তর নহে। রক্তকরবী নাটকের রসাস্বাদনে এই আনন্দ-তত্ত্বটিই আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই আনন্দতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণে দেখিলে নাটকটির বিভিন্ন বিষয়গুলি তাহাদের গুরুত্ব লইয়া ধরা পড়িবে এবং নাটকটির রসকেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করিতে চাই, তাহা হইল রক্তকরবী নাটকের আলঙ্কারিক বিচারের কথা। শিল্পের দুইটি দিক থাকে। একটি হইল matter বা বিষয়বস্তুর দিক, আর একটি হইল form বা আঙ্গিকের দিক। একটি অপরটির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। 'রক্তকরবী'র form লইয়া অনেক তর্কবিতর্কের সুযোগ রহিয়াছে। সেই তর্কবিতর্ককে মুখ্য করিয়া তুলিলে রসের আলোচনা কলহের অন্তরালে চাপা পড়িয়া যায়। 'রক্তকরবী' সূত্রানুযায়ী কতখানি নাটক হইয়াছে, অথবা রূপকনাটক হিসাবে তাহার পরিচয় কতখানি যথার্থ, প্রভৃতি প্রশ্নের দ্বারা আমরা রস-বস্তুর সন্ধান পাই না। ইহাতে আলঙ্কারিক মনের তৃপ্তি, কিন্তু রসিক-চিত্ত অন্য জিনিস খোঁজে। রসিকের প্রশ্ন,—'রক্তকরবী'র প্রাণবস্তু কি, তাহাতে জীবনের কোন্ চিত্র কি ভাবে রসরূপ লাভ করিতেছে? এখানে রসিক চিত্তেরই জিজ্ঞাসা মিটাইবার আয়োজন করা হইয়াছে, ইহাতে আলঙ্কারিককে হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট করা যাইবে না। তথাপি form এর কথা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। নাট্যবস্তুর বিশিষ্টতার জন্য form-এ যে বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

অতঃপর রক্তকরবী নাটকের ভাববস্তুর বিশেষত্ব আরও একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাক। পূর্বে বলিয়াছি যে মৃত্যুর উপলব্ধিতে বিকৃত জীবন হইতে সহজ জীবনের জন্য যে সাধনা, রক্তকরবী নাটকে তাহারই কথা বলা হইয়াছে। সহজ জীবন অর্থে ব্যাপক স্থায়ী ও বিশুদ্ধ আনন্দের উপলব্ধি যে জীবনে। অতঃপর এই আনন্দকে উত্তম আনন্দ বলিয়া উল্লেখ করিব। রক্তকরবী নাটকে দেখানো হইয়াছে যে বিকৃত জীবন এই উত্তম আনন্দকে লাভ করিতেছে নারী-প্রেমের মধ্য দিয়া, তাই যে সকল জীবন উত্তম আনন্দ লাভ করিয়া সহজ জীবনের পথে চলিতেছে, তাহারা সকলেই পুরুষ। এই পুরুষদের জীবনে একটি নারী আসিয়াছে, যে নারীর নিকট হইতে তাহারা সহজ জীবনের আহ্বান অনুভব করিতেছে। ইহাতে তাহাদের গতানুগতিক জীবনে একটি দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে এবং সেই দ্বন্দ্ব-মুক্তিতে তাহাদের সহজ জীবনে উন্নতি ঘটিয়াছে। কবিগুরু নারীর প্রতি প্রেমকে এই উত্তম আনন্দ লাভের উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে এই উত্তম আনন্দও একটি বিশিষ্ট অর্থে সীমা লাভ করিয়াছে।

নারীর প্রতি প্রেমকেই উত্তম আনন্দলাভের উপায় বলিয়া মনে করিলে কেমন যেন একটি খট্‌কা বাধিয়া যায়। বিকৃত জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং সকল অপূর্ণতার পূরণ নারীর প্রতি প্রেমোপলব্ধিতে, এই কথাটি মন সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। বাস্তব জীবনের সমস্যাকে একটি বিশেষ হৃদয়বৃত্তির দ্বারা কিরূপে অতিক্রম করা যাইবে তাহা ভাবিয়া পাই না। উপরন্তু, যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলেন তাঁহারাও এই নারী-প্রেমকেই সত্য লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া মানিয়া লইতে চাহিবেন না। নারী-প্রেমের দ্বারাই যাঁহারা জীবনের সাধনা করিয়াছেন (এ প্রসঙ্গে একমাত্র চণ্ডীদাসের কথাই মনে পড়ে) তাঁহারাও নারীর প্রেমে এক ভাগবত-চেতনা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সাধারণ জৈব প্রেমের পর্যায়ে পড়ে না। তাহার ক্ষেত্র অতিলৌকিক এবং তাহার প্রকৃতিও অতিমানবিক।

রক্তকরবী নাটকে কবিগুরু যে প্রেমধর্মের কথা বলিয়াছেন, যথাস্থানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখন এই প্রেমধর্মের অবতারণায় রক্তকরবীর ভাববস্তু যে নির্দিষ্ট সীমা লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিয়া দেখা যাক।

নারী তাহার রমণীয় রূপ ও কমনীয় কান্তি লইয়া আমাদের যে বাসনার ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই বাসনালোকে আমাদের চিত্ত জাগরণের কথাই কবিগুরু বলিয়াছেন। সেই নারী কোন একটি ভাবস্বরূপা, তত্ত্বস্বরূপা নহে। সে আমাদের এই পৃথিবীরই রক্ত-মাংসের মানবী। সেই নারী তাহার বিক্ষুব্ধ বক্ষের বেদনা লইয়া, মধুর ললাটের লাবণ্য লইয়া এবং উত্তপ্ত হৃদয়বৃত্তির উচ্ছ্বাস লইয়া যক্ষপুরীর জীবনের দরজায় আঘাত করিয়াছে। সেই আঘাতে পুরুষ-চিত্তের বাসনা বিকশিত হইয়াছে, সুরু হইয়াছে তাহার জীবন-দ্বন্দ্ব। এই জীবন-দ্বন্দ্ব তাহাদিগকে সহজ জীবনে উন্নীত করিতেছে। ইহাতে নর-নারীর হৃদয়ের সম্বন্ধের কথাই বলা হইয়াছে। স্ব স্ব হৃদয়বৃত্তি লইয়া বিভিন্ন চরিত্রগুলি তাই এক একটি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়াছে। আবার নন্দিনীর মধ্য দিয়া যে সৌন্দর্যের প্রকাশ তাহা নারীরই দেহ-সৌন্দর্য। নন্দিনী সৌন্দর্য-তত্ত্ব-স্বরূপা নহে, সৌন্দর্য তাহার মধ্যে নারীদেহের সীমায় বিশিষ্ট। এই সৌন্দর্য-বোধের অভাব, এই প্রেম-বোধের অভাব যে জীবনে, সেই বিকৃত জীবনের কথাই রক্তকরবী নাটকে বলা হইয়াছে। এই প্রেম, এই সৌন্দর্য যে আনন্দ বহন করিয়া আনে, সেই উত্তম আনন্দের কথা এবং সেই আনন্দের আধার যে সহজ জীবন, সেই সহজ জীবনের কথা রক্তকরবী নাটকে বলা হইয়াছে। এই দিক হইতে রক্তকরবীর ভাববস্তুকে চিনিয়া লইতে হইবে। ইহাতে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে এই পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষ বলিয়াই বোধ হইবে, তাহাদিগকে কোন ভাবের প্রতীক বলিয়া ভ্রম হইবে না। রক্তকরবী নাটকের ভাববস্তুর এই পরিচয়টিকে উপেক্ষা করিয়া যদি তাহার মধ্যে কোন রূপকার্থকে প্রাধান্য দিই তবে নাট্যবস্তুর রসের আবেদন আমাদের নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং তাহার যথার্থ রসরূপটি আমাদের নিকট ধরা পড়িবে না। আমাদের রসিক মনের দুইটি দিক আছে, একটি হইল জ্ঞানের দিক, আর একটি হইল বোধের দিক। একটিতে বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতা, অপরটিতে হৃদয়বৃত্তির। সাহিত্যের আবেদন মূলতঃ আমাদের হৃদয়বৃত্তির কাছে। তথাপি বুদ্ধিবৃত্তি আসিয়া রসগ্রহণে খানিকটা ভাগ বসাইতে চায়, বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিলে হৃদয়বৃত্তির যেন একটি আভিজাত্য বাড়িয়া যায়। কিন্তু সাহিত্য হইতে রসোপলব্ধির সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি ততটুকু প্রয়োজন যতটুকুতে চিন্তার জড়তা ও স্থূলতা দূর করিতে সাহায্য করে। নচেৎ

বুদ্ধিবৃত্তিই একাধিপত্য বিস্তার করিলে বোধটি আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে। রসিক মনের এই বিপর্যয় সম্বন্ধে কবিগুরু সচেতন হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রোতাদের নিকট নাট্য-রসোপলব্ধির একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—"রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্ম-প্রকাশ। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে তার দায় কবির নয়।"

এই নন্দিনীকে মানবী বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেকেই আপত্তি করেন। নন্দিনীকে তত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়া গণ্য করিয়া অনেকে নাটকটির ব্যাখ্যা করিতে চান। অথচ ইতিপূর্বে নাটকের ভাববস্তু প্রসঙ্গে যে কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে নন্দিনীকে রূপক বা প্রতীক বলিয়া গণ্য করা যায় না। নাটকের শিল্প-ভঙ্গীর দিক হইতেও অনেকে নন্দিনীকে এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিকে প্রতীকার্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কবিগুরু তাঁহার নাটককে রূপক নাটকের পর্যায়ে ফেলিতে চাহেন না, অথচ 'রক্তকরবী' নাটককে একখানি সাধারণ নাটকও বলা চলে না। নাট্যবস্তুর বিশিষ্টতার জন্যই নাটকের শিল্প-ভঙ্গীতে বিশিষ্টতা আসে। নন্দিনীকে কবিগুরু মানবী বলিয়া দাবী করিতেছেন, অথচ নাটকটি একটি সাধারণ নাটক হইয়া উঠিতেছে না, নাটকের শিল্প-ভঙ্গীর বিচারে যথাস্থানে এই বিরোধটির আলোচনা করা যাইবে।

কিন্তু শ্রেণী হিসাবে নাটকটির পরিচয় যাহাই হউক না কেন, ইহার ভাববস্তু যে মানব জীবনের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ্ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন।...এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল,

প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

কবিগুরু এই যে ভাববস্তুর কথা বলিয়াছেন, এই দিক দিয়া দেখিলে রক্তকরবী নাটকের রসবস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্বে আমি যে ভাববস্তুর কথা বলিয়াছি, তাহার সহিত ইহার বিরোধ নাই। কবিগুরু এখানে ভাববস্তুর সহিত নাট্যবস্তুরও উল্লেখ করিয়াছেন। কবিগুরু তাই বিশেষ করিয়া রাজার চরিত্রটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। নারীর প্রতি প্রেমে সহজ জীবনে উন্নতি যদি নাটকের ভাববস্তু হয়, তাহা হইলে দেখিব যে নারীশক্তি শুধুমাত্র রাজার চরিত্রের উপরেই কাজ করে নাই, নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও তাহা প্রভাবিত করিয়াছে। এই প্রভাবে সকলের মধ্যেই একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। এই জীবন-দ্বন্দ্বে কে কোন্ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ভাববস্তুর দিক হইতে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

নাটকের দুইটি দিক আছে, একটি বিস্তৃতির দিক, আর একটি গভীরতার দিক। নাট্যবস্তুর মধ্য দিয়া এই বিস্তৃতিটি ধরা পড়ে, ভাববস্তুর মধ্য দিয়া আমরা নাটকের গভীরে প্রবেশ করিতে পারি। সাধারণতঃ নাটকে একটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া নাট্যবস্তু ও ভাববস্তু উভয়ই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সেই চরিত্রটির মধ্য দিয়াই নাটকটি তাহার বিষয়ের বিস্তৃতি ও গভীরতা লইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রক্তকরবী নাটকে এই দুইটি দিক দুইটি চরিত্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নাট্যবস্তু, তথা নাটকের বিস্তৃতির দিকটি প্রকাশ পাইতেছে রাজার চরিত্রের মধ্য দিয়া এবং ভাববস্তু, তথা নাটকের গভীরতার দিকটি প্রকাশ পাইতেছে বিশুর চরিত্রের মধ্য দিয়া।

তাই নাট্যবস্তুর দিক দিয়া রাজার চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিলেও ভাববস্তুর অনুসরণে রাজার চরিত্রকে একমাত্র বলিয়া গণ্য করিলে চলিবে না। রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি নাটকে যাহা দেখানো হইয়াছে তাহাতে নাটকের ভাববস্তুকে আমরা অনেকাংশে ধরিতে পারি বটে, কিন্তু ভাব-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে গেলে এইখানেই থামিলে চলিবে না। রাজাই যক্ষপুরীর জীবনের নিয়ন্তা, তাহার কর্ণধার, রাজার চরিত্র-বিকাশের উপর সমগ্র কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং রাজার চরিত্রকে

কেন্দ্রে রাখিয়া আর সকল চরিত্রগুলি আবর্তিত হইতেছে। সে দিক দিয়া বিশুও একটি পার্শ্বচরিত্র (Side character)। আপনার চতুর্দিকে বন্ধনজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথে রাজার যাত্রা স্থরু করাই নাটকের নাট্যবস্তু।

কিন্তু সহজ জীবনের কথাই যদি নাটকের ভাব-বস্তু হয় তাহা হইলে দেখি যে বিশুর স্থান রাজার অপেক্ষা আরও গভীরে। রাজার সম্মুখে এখনও কঠোর সংগ্রাম রহিয়াছে, বিশুর সংগ্রাম সমাপ্তপ্রায়। বিশুর মধ্য দিয়াই আমরা সহজ-জীবনের পূর্ণ রূপটি দেখিতে পাই। রাজা যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বিশু সেই স্থান অতিক্রম করিয়াছে। বিশুর যে জীবন, সেই জীবন-কথাই রক্তকরবী নাটকের ভাববস্তু। রক্তকরবী নাটকের ভাব-বস্তুকে এই দিক হইতে চিনিয়া লইতে হইবে, নতুবা আমরা নাটকটির গভীরে প্রবেশ করিতে পারিব না, বাহির হইতে নাট্যবস্তু এবং তাহার শিল্প-ভঙ্গীকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। ইহাতেও যে রসাস্বাদন হইবে না তাহা নহে, কিন্তু ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিলে অনেক ভোজ্যবস্তু ফেলা যাইবে, যথার্থ রসিকের পক্ষে যাহা ক্ষোভের বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প-ভঙ্গী

রক্তকরবী নাটকের ভাববস্তুর কথা উল্লেখ করিয়াছি, এখন শিল্প-ভঙ্গীর বিশিষ্টতা নিরূপণের চেষ্টা করিব। শিল্প-ভঙ্গীর বিশিষ্টতাটি ধরিতে না পারিলে নাটকের form হইতে matterটিকে উদ্ধার করা যাইবে না। রক্তকরবী নাটকের শিল্প-ভঙ্গী লইয়া অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ রূপক নাটকের পর্যায়ে ফেলিয়া যাহারা রক্তকরবীর শিল্প-ভঙ্গীর বিচার করেন, তাঁহারা রূপকের ব্যঙ্গ্যার্থের অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাটকের মধ্যে একটি তত্ত্ব-রূপকে বড়ো করিয়া তোলেন। জীবনের রসরূপটি ইহাতে অনেক সময় চাপা পড়িয়া যায়। এখানে রসরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নাটকের শিল্প-ভঙ্গীর একটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে যথার্থ আলঙ্কারিক বিচার হইবে কি না জানি না, কিন্তু নাটকটিকে যে ইহাতে ভুল বুঝানো হইবে না তাহা নিশ্চিত। অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া সকল সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে সব সময় সুফল লাভ করা যায় না। অনেক সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সৃষ্টি আপনার বৈশিষ্ট্যে একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী রচনা করিয়া লয়। সেই ভঙ্গীটিকে গতানুগতিক শিল্প-ভঙ্গীর সহিত মিলাইয়া লইতে না পারিলে সাহিত্যিককে দোষ না দিয়া যে বিশিষ্ট রসপ্রেরণার জন্য শিল্প-ভঙ্গিটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সেই বিশিষ্ট রসপ্রেরনাকে আগে ধরিতে হয়। যদি তাহার [illegible] আমরা কোন অভিনবত্ব দেখিতে পাই এবং রচনার matterটি রসোত্তীর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে formটির একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিতে পারি।

রূপক-নাটক সাহিত্যের এমনই একটি বিশেষ শিল্প-ভঙ্গী, যাহাকে নাট্য-সাহিত্যের formula অনুযায়ী মিলাইতে গিয়া সাহিত্য-সমালোচনার আসরে বহু বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। সাহিত্যের এই অভিনব রূপটিকে সাধারণ নাট্য-রূপের সহিত মিলাইতে না পারিয়া অনেকেই ইহাকে গাল পাড়িয়াছেন। এই গালাগালির আসরে পাটি পাড়িয়া না বসিয়া এখানে শুদ্ধমাত্র একতরফা কতকগুলি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

জীবনের সহিত যোগে সাহিত্যিক যদি জীবনের একটি রসরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা জীবনের একটি শিল্প-রূপ প্রকাশ পায়।

জীবনের সহিত যোগের বিশিষ্টতা অনুযায়ী শিল্প-রূপের বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। এই শিল্প-রূপ যেমনই হউক না কেন, ইহার মধ্যে যদি জীবনের একটি রস রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, অথবা ইহার মধ্য দিয়া যদি বুঝিতে পারি যে সাহিত্যিক জীবনের সহিত যোগে জীবনের একটি রসমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা হইলে সাহিত্যিকের প্রতিভা অবশ্যই স্বীকৃত হইবে।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি যে কোন শিল্প-ভঙ্গীর মধ্যেই সাহিত্যিকের এই রসসাক্ষাতের পরিচয় আমরা পাই। রূপক নাটকেও আমরা অনুরূপ বিষয়টি দেখি। সেখানেও সাহিত্যিক রস-চেতনায় যাহা উপলব্ধি করেন, এই বিশেষ শিল্প-ভঙ্গীটির মধ্য দিয়া তাহাকে রূপ দিবার চেষ্টা করেন। এখন একটি শিল্প-ভঙ্গীর মানদণ্ডে অপর একটি শিল্প-ভঙ্গীর মূল্য নির্ণয় করা চলে না। শিল্পীর শিল্প যদি রসোত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে সে শিল্প যে সার্থক তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। Formএর বিভিন্নতায় শিল্পীর রসিকতার ভেদ নির্ণয় করা চলে না। সাহিত্যের বিচারে যদি এই formএর মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসে তাহা হইলে সাহিত্যের ভোজে অনেক সুখাদ্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া ফেলিয়া দিব। শিল্প-রূপটিকে বিশেষভাবে চিনিবার জন্য আলঙ্কারিকগণ formএর বিভেদ করিয়া থাকেন, কিন্তু রসাস্বাদনের পক্ষে এই বিভাগটিকে চরম করিয়া দেখিলে চলে না। শিল্পটি তাহার সেই বিশিষ্ট formএর মধ্যে কতখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাই বিচার্য।

সাহিত্যের আসরে আমরা রূপক-নাটকের যে রূপটি দেখি, তাহাতে তাহাকে যদি সাধারণ নাটকের সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিতে চাই, তবে তাহার উপর সুবিচার করিতে পারি না। রূপক নাটকে সাধারণভাবে নাটকের মূল লক্ষণটি বিদ্যমান; তাহা হইল, ঘটনার পারম্পর্য বিধানে অভিনয়ের সাহায্যে একটি কাহিনীকে রূপদান করা, অথচ সাধারণ নাটকের মতন ইহাতে ঘটনার প্রাধান্য ও বৈচিত্র্য নাই, চরিত্র-চিত্রণেরও কোন বিশেষ প্রয়াস নাই। এখানে কতকগুলি ভাব আর কতকগুলি ভাবের অনুগামী মাত্র। এই ভাব-পরম্পরায় মূল ভাবটি পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিচিত্র জীবন-দ্বন্দ্ব দেখানো ইহার উদ্দেশ্য নয়। একটি বিশেষ ভাবকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। ধীরে ধীরে ভাবকেন্দ্রের আবরণ উন্মোচন করার মধ্যেই দৃশ্য-দৃশ্যান্তরের অবতারণা হয় এবং তাহাতেই শিল্পের একটি নাট্যরূপ ফুটিয়া উঠে।

ইহাতে সাধারণ নাটক হইতে আমরা যাহা পাই, রূপক নাটকে তাহা লাভ করি না। বস্তুতঃ সেক্সপীয়রের নাটকের মানদণ্ডে যখন রূপক নাটকগুলিকে বিচার করি, তখন রূপক নাটকগুলিকে নাটক হিসাবে অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ সেক্সপীয়রের নাটকে জীবনের যে রসরূপটি দেখিতে পাই, যে বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি এবং ঘটনা-সংঘাতের সমাবেশ সেখানে দেখি, রূপক নাটকে তাহার চিহ্ন কোথায়। তাহার তুলনায় নাট্য-শিল্প হিসাবে রূপক নাটক নিতান্ত নগণ্য হইয়া পড়ে।

এইরূপে সেক্সপীয়রের দোহাই দিয়া যদি কেহ রূপক নাটক সম্বন্ধে কোন রায় দিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আর কোন তর্ক চলে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। ক্লাসিকাল সংগীতে আমরা যে রস পাই তাহা যদি বাণী-প্রধান রবীন্দ্র-সংগীতে খুঁজিতে যাই তাহা হইলে আমাদিগকে হতাশ হইতে হইবে। সংগীত হিসাবে উভয়ে এক জাতির হইলেও শিল্প হিসাবে উভয়ে সম্পূর্ণ পৃথক এবং উহাদের রসের আবেদনও বিভিন্ন। রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে যদি ক্লাসিকাল সংগীতের অপূর্ব সুর-বিন্যাস দেখিতে না পাই, তাহা হইলে রবীন্দ্র-সংগীতকে গাল পাড়িলে চলিবে না, পরন্তু তাহার বিশিষ্ট আবেদনটিকে চিনিয়া লইতে হইবে। আম ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু আতাকে ভুল করিলে চলিবে না। আতার মধ্যে ফজলি আমের স্বাদ খুঁজিতে গেলে হয়তো বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হইবে, কিন্তু ইহাতে রসিকতার পরিচয় দেওয়া হইবে না। রূপক নাটকে সাধারণ নাটকের মত বাস্তব-ঘটনার ঠাস-বুনন, অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা এবং নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ খুঁজিয়া না পাইলে তাহাকে নাটক হিসাবে হয়তো বাতিল করা যায়, কিন্তু সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ইহাতেই ছেদ টানিলে চলে না। তাহার জন্য আরও একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়।

স্বতন্ত্র সাহিত্য-শিল্প হিসাবেও রূপক নাটকের মূল্য অনেকে স্বীকার করেন না। রূপক নাটকের শিল্পী জীবনের সহিত যোগে জীবনের বাস্তব রূপটিকে গ্রহণ করেন না, ইহাকে escape করিয়া তাঁহারা জীবনের একটি ভাব-নির্যাসকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জীবনের বস্তুরূপ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক চিন্তার দ্বারা ছাঁকিয়া যে ভাব-নির্যাস বাহির করেন, তাহাই রূপকের এবং সঙ্কেতের সাহায্যে আমাদের নিকট উপস্থিত করেন। ইহাতে জীবনের বাস্তব ঘটনাপ্রবাহকে অস্বীকার করা হয়। সেই জন্য রূপক

নাটকের মধ্যে আমরা জীবনের সহিত একটি নিবিড় রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারি না। ইহাতে জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব, কতকগুলি ভাব-সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রূপক নাটকের রসের আবেদন তাই আমাদের সাধারণ জীবনোপলব্ধির নিকট ততটা নয়, যতটা আমাদের এক আধ্যাত্মিক জীবনোপলব্ধির নিকট। এই জন্য রূপক নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারে না, তাহা mass appealing না হইয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে।

রূপক নাটকের এই সংকীর্ণ পরিধি, ইহারই জন্য অনেকে ইহাকে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে গণ্য করেন না। রূপক-নাট্যকার জীবনকে তাহার বিস্তৃতি, গভীরতা ও বৈচিত্র্য লইয়া স্বরূপে ধরিতে পারেন না। গোলাপ ফুল হইতে আতরটুকু বাহির করিয়া লওয়ার মত জীবন হইতে তাঁহারা একটি ভাব-নির্যাস বাহির করিয়া লন। তাহাতে আমরা জীবনের একটি concentrated form লাভ করি মাত্র, সকল রূপ-বৈচিত্র্য লইয়া জীবনের একটা স্বাভাবিক মূর্তি আমরা দেখিতে পাই না।

The Heritage of Symbolism গ্রন্থে C. M. Bowra বলিতেছেন—"The essence of symbolism is its insistence on a world of ideal beauty and its conviction that this is realised through art......A peculiar intensity is what the symbolists sought to give. In their loyalty to this aim they had to break with many familiar characteristics of poetry. Above all they avoided those public and political themes which were bar to the romantics. For the symbolist absorbed in an ideal beauty, politics are an alien and hostile theme."

তাই গোলাপের আতর অপেক্ষা গোলাপ যেমন শ্রেয়ঃ, রূপক নাটক অপেক্ষা সাধারণ নাটক তেমনি শ্রেয়ঃ। গোলাপ হইতে আতরটুকুকে বাহির করিতে গিয়া গোলাপ ফুলের রূপ-মাধুর্যটি নষ্ট হইয়া যায়; জীবন হইতে সেইরূপ ভাব নির্যাসটুকু ছাঁকিয়া লইতে গিয়া জীবনের রূপমাধুরীর আবেদনটি ঢাকা পড়ে। গোলাপের আতর যাঁহারা তৈয়ারী করেন, তাঁহারা গোলাপ ফুল রচয়িতার অপেক্ষা বেশী রসিকতার পরিচয় দেন কিনা সন্দেহ। রূপক-নাট্যকার জীবনকে এই যে একটি concentrated form এ উপস্থিত করেন

ইহাতে তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্য অপেক্ষা শিল্পে অসাফল্যই প্রকাশ পায়। উপরন্তু তাঁহারা রূপক নাটকের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের জন্য যে সূক্ষ্ম মননশীলতার দাবী করেন, তাহা বস্তুতঃ জীবনপর্যবেক্ষণে মননশক্তির জীর্ণতার নামান্তর।

এইরূপ বিচারে অনেকেই সাহিত্য-শিল্প হিসাবে রূপক-নাটকের গৌরবকে লাঘব করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এইরূপে একের পরিপ্রেক্ষিতে অপরকে দেখিলে রূপক-নাটকের একটা মূল্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। সাহিত্যের ভোজে আমও আছে, আঙুরও আছে। আমের বাটখারায় আঙুরকে ওজন করিতে গেলে আঙুর ব্যবসায়ীর ঠকিবারই কথা। রূপক নাটককে সেভাবে বিচার না করিয়া একটু স্বতন্ত্র ভাবে তাহাকে যাচাই করিয়া দেখার প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহার একটি বিশিষ্ট মূল্য ধরা পড়িলেও পড়িতে পারে।

রূপক কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দেখি, 'রূপ' এই শব্দের উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া রূপক কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। নিকৃষ্টার্থে 'ক' প্রত্যয় হয়। মানব শব্দের উত্তর 'ক' প্রত্যয় হইলে মানবক হয়। মানবক অর্থে বামন, অর্থাৎ নিকৃষ্ট মানব। সেইরূপ রূপক অর্থে রূপের নিকৃষ্টতা বুঝায়, অর্থাৎ যাহা পরিপূর্ণভাবে রূপ লাভ করে নাই। যাহা রূপে পরিপূর্ণভাবে মূর্ত হয় নাই অথচ যাহার মধ্যে রূপের একটি ভাব রহিয়াছে, তাহাই রূপক। জীবনের মধ্যে অনেক ভাব রূপ গ্রহণ করে। জীবনের এই রূপগুলির সহিত আমরা বিশেষ পরিচিত। কিন্তু জীবনে এমন অনেক ভাব রহিয়াছে যাহা জীবনের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে নাই, কিন্তু যাহা জীবনের মধ্য ...য়া রূপ-পরিগ্রহণের অপেক্ষায় আছে। আমাদের বাস্তব জীবনে এই ভাবগুলির সহিত পরিচিত হইবার উপায় নাই, ইহাদিগকে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনায় একটি রূপের ভাবে কল্পনা করি মাত্র, এই ভাবগুলিই রূপকের উপাদান। যাহারা ধ্যানী, তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে এই ভাবগুলিকে স্পর্শ করেন এবং আমাদের নিকট সেগুলিকে উপস্থিত করিয়া আমাদের বোধকে বিস্তৃত করিয়া দেন। সাধারণ নাট্য-সাহিত্যের আবেদন যেমন মূলতঃ আমাদের আধিভৌতিক জীবনের কাছে, রূপক-নাট্য-সাহিত্যের আবেদন তেমনি মূলতঃ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কাছে। এই আধ্যাত্মিক চেতনা যাহার জাগ্রত হয় নাই, রূপক নাটকের রসের আবেদন তাঁহার নিকট ব্যর্থ। তিনি রূপক নাটকের মধ্যে জীবনের সাধারণ রূপ-বৈচিত্র্যকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া হতাশ হইবেন। রূপক নাটকে বাস্তব জীবনের চিত্র নাই, তাহার কারণ, রূপময়

বাস্তব জীবন রূপক-নাট্যকারের শিল্প-প্রেরণা নয়। তিনি যাহার কথা বলেন, তাহা রূপে নাই, কিন্তু রূপকে আছে। তাহার কথা বলিতে গিয়া তিনি যে সব চিত্র আঁকেন, যে সব কথা বলেন, তাহা অত্যন্ত সাঙ্কেতিক ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। উপযুক্ত মন-প্রস্তুতি না থাকিলে অনেক সময়েই তাহা দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। তাই ইহাতে সকলের অধিকার নাই। রূপক নাট্যকার তাঁহার নাটককে mass appealing করিয়া তুলিবার দিকে কোন লক্ষ্যই রাখেন না, তিনি শুধু রূপাতীত ভাববস্তুকে নানা আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়া ক্ষান্ত হন। আভাসে-ইঙ্গিতে জানাইতে হয়, কারণ ভাববস্তুকে কোন বিশেষ রূপে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার উপায় নাই, ভাববস্তুর কোন রূপই আসলে নাই। রূপাতীতের একটা রূপাভাস দেওয়াই রূপক-নাটকের কাজ। রূপাতীতের ধ্যানটি শিল্পীর মধ্যে যত গভীর হয় এবং যত নিপুণতার সহিত তিনি তাঁহার ধ্যানলব্ধ ভাব-বস্তুটিকে আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারেন, তাঁহার শিল্প ততই রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠে। রূপক নাটকের বিচারে এই দুইটি বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রূপক-নাটকে রক্ত-মাংসের জীবনের পরিচয় পাইলাম না কেন, এ কথা লইয়া তর্ক করিতে যাওয়ার সুযোগ নাই, রূপক নাটকের ক্ষেত্র তাহা নহে।

এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি রূপক-নাটক একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-শিল্প; তাহার শিল্প-প্রেরণা ও শিল্প-ভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক। জীবন-রূপায়ণের অক্ষমতায় রূপক-নাটক গড়িয়া উঠে নাই, জীবনের সহিত যোগের একটি বিশিষ্টতাই রূপক নাটকে প্রমাণিত হইয়াছে। জীবন সম্বন্ধে সেই attitudeকে যাহারা escapism বলিয়া তাহার মূল্য হ্রাস করিতে চান, তাঁহারা সাহিত্য-বিচারে একদেশদর্শিতার পরিচয় দেন। উত্তরে তাঁহাদিগকে শুধু এই কথাই বলা চলে যে, জীবনের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ মননশক্তির জীর্ণতা নহে এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইতেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব। বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহার একটি অন্যতম নিদর্শন।

রূপক নাটকের ভাববস্তু রূপাতীত এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাহার জন্য যে জীবন-দ্বন্দ্ব, তাহা মানবিক। রূপগত মানবজীবনে রূপাতীত ভাবের জন্য যে দ্বন্দ্ব, তাহাই রূপক-নাট্যকারের শিল্প-প্রেরণা। এই রূপাতীত ভাববস্তুটিকেই রূপকের সাহায্যে উপস্থিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি এই হিসাবে রূপক নাটকের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'রাজা' একটি

রূপাতীত অতীন্দ্রিয় ভাবসত্তা। 'অন্ধকার ঘরের রাজা' এই রূপকের মধ্য দিয়া তাহাকে ব্যঞ্জিত করা হইয়াছে। রাজার ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতিও গূঢ়ার্থপূর্ণ। এই রাজাকে কেন্দ্রে রাখিয়া অন্যান্য যে সকল পার্শ্ব চরিত্র দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই মানব। তাহারা তাহাদের স্ব স্ব হৃদয়বৃত্তির বৈশিষ্ট্য লইয়া এক একটি বিশিষ্ট জীবন-দ্বন্দ্বের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই জীবন-দ্বন্দ্ব তাহা অতিমানবিক লোকে প্রতিষ্ঠিত। তাই নাটকের পাত্র-পাত্রীর জীবন দ্বন্দ্ব আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বন্দ্ব, ব্যবহারিক আধিভৌতিক জীবনের দ্বন্দ্ব সেখানে বিশেষ স্থান পায় নাই।

'রাজা' নাটকে জীবন-দ্বন্দ্বের এই আধ্যাত্মিকতার সীমা খুব অধিক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। মানবিক বুদ্ধি এবং মানবিক মনের দ্বারাই তাহা গ্রাহ্য, তাহা এই পৃথিবীরই বাসনা-পীড়িত মনের একটি সূক্ষ্মতর জিজ্ঞাসা। মানব-মন ও মানব-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া তাহা কোন অতিলৌকিক জীবন-রূপায়ণের কথা বলে না। সুদর্শনার জীবন-দ্বন্দ্ব সুদর্শনাকে অতিমানবিক করিতেছে না, তাহাকে একটি 'বৃহত্তর' মনোজীবনে উন্নীত করিতেছে।

রূপক-নাটকের এই যে রূপাতীত ভাববস্তুর কথা বলিলাম, তাহা সব সময়েই আধ্যাত্মিক জীবনকে অবলম্বন করে না। আমাদের এই সাধারণ আধি-জীবনেও বহু রূপাতীত ভাববস্তু রহিয়াছে। রূপক-নাটকে তাহার কথাও বলা হইয়া থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আঙ্গিকের দিক দিয়া রূপক-নাটক বলিয়া বোধ হইলেও নাটকের ভাববস্তু রূপগত, রূপাতীত নহে। এই রূপগত ভাববস্তুকেই বিভিন্ন সঙ্কেতের মাধ্যমে বিভিন্ন form এ উপস্থিত করা হয়। সেখানে সঙ্কেতের সাহায্যে রূপ-কেই প্রকাশ করা হয়, রূপক-কে নহে। এই শ্রেণীর নাটককে রূপক-নাটক না বলিয়া সাঙ্কেতিক নাটক বলাই শ্রেয়।

সাঙ্কেতিক নাটকে একটি রূপের দ্বারা আর একটি রূপকে ইঙ্গিত করা হয়, রূপক-নাটকে একটি রূপের দ্বারা আর একটি রূপাতীতকে ইঙ্গিত করা হয়। রূপক-নাটকের মধ্যে মূলতঃ একটি আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলা হয়, তবে আমাদের এই আধি-জীবনকেও তাহা অবলম্বন করিতে পারে। সাঙ্কেতিক নাটক রূপগত আধি-জীবনের কথাই বলিয়া থাকে, যখন তাহা আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলিতে চায় তখন রূপাতীতকে ব্যঞ্জিত করিতে গিয়া তাহা রূপক-নাটকের রূপ লাভ করে।

ভাবাশ্রয়ী নাটকের এই যে তিনটি শ্রেণী বিভাগ দেখাইলাম, ইহা গতানুগতিক নাট্যশাস্ত্রসম্মত কিনা জানিনা; এই সম্বন্ধে প্রতিপক্ষের অনেক তর্কের অবকাশ হয়তো থাকিতে পারে। রক্তকরবী নাটকের বিশিষ্ট শিল্প-ভঙ্গীটি নির্দেশ করিবার জন্যই এই বিভাগটি দেখাইয়াছি। ইহাকে চরম বলিয়া কেহ না মানিতেও পারেন, অন্ততঃ তাহার জন্য এ-স্থানে তর্কজাল সৃষ্টি করিতে চাহি না।

রূপক-নাটকের যে পরিচয় দিলাম এবং ইতিপূর্বে রক্তকরবীর ভাববস্তুর যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে রক্তকরবী যথার্থ রূপক-নাটক নহে। রক্তকরবীর ভাববস্তু কোন রূপাতীত বিষয়কে অবলম্বন করে নাই, এবং তাহার জীবনভূমিও কোন আধ্যাত্মিক জীবনভূমি নয়। ইহাতে আমাদের বিকৃত জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেখানে যে সহজ জীবনের কথা বলা হইয়াছে তাহাও একটি রূপগত বিষয় এবং আমাদের জীবনের মধ্যেই তাহা রূপে লভ্য।

অতঃপর রক্তকরবী নাটকের সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকিয়া যায়। অনেকেই রক্তকরবীকে সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়া অভিহিত করেন এবং সঙ্কেতগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া নাটকটির একটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন। 'বারোয়ারীর প্রবীণ মণ্ডলীর' এই প্রচেষ্টার তাগিদে স্বয়ং কবিকে আসরে নামিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। কবির কৈফিয়তের মূলে যে যুক্তিটি রহিয়াছে তাহা মোটামুটি এই যে, সাহিত্য সৃষ্টিতে জীবনের রূপায়ণে সাহিত্যিক জীবনের একটি রসরূপ দিবার প্রয়াস করেন। ইহার মধ্যে যদি কোন সাঙ্কেতিকতা থাকিয়া যায়, অর্থাৎ শিল্পরূপের প্রকাশ্য অর্থের অন্তরালে যদি কোন গূঢ় তত্ত্বগত অর্থের সঙ্কেত পাওয়া যায় যে অর্থ জীবনের সেই রূপটিকে আচ্ছন্ন করে, তবে রসাস্বাদনে সেই অর্থটিকে গৌণ করিয়াই ধরিতে হইবে। অবশ্য যেখানে সাঙ্কেতিক নাটক রচনা করাই সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য, সেখানে পৃথক কথা, কিন্তু যেখানে শিল্পী সাধারণভাবে জীবনের একটি রসরূপ দিতে চাহিতেছেন, সেখানে শিল্পরূপের সাঙ্কেতিক অর্থকে লইয়া টানাটানি করিলে রসের আবেদনটি ব্যর্থ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের একটি সাঙ্কেতিক অর্থ বাহির করিয়া কবি আপনার বক্তব্যটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কবি দেখাইয়াছেন যে, তাত্ত্বিকের চশমা লইয়া দেখিলে রামায়ণ হইতে একটি সাঙ্কেতিক অর্থ বাহির করা যায় এবং সাঙ্কেতিক সাহিত্য হিসাবে তাহার একটি পূর্ণ পরিচয় দেওয়া

সম্ভব হয়। রামায়ণ হইতে এই সাঙ্কেতিক অর্থের আবিষ্কারটি এখানে কবির তাত্ত্বিক মনের কাজ। যাঁহারা তত্ত্ব আবিষ্কারের নেশায় সঙ্কেত সঙ্কেত করিয়া মাথা ঘামাইয়া ফেলেন কবি তাঁহাদের জন্যই রামায়ণের সাঙ্কেতিক অর্থটি উপস্থিত করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন, "দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটি বন্য বানর লেজে করে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা-হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটি কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন—গোপনে যে অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।"

এইরূপে কবি ইঙ্গিত করিতেছেন যে রামায়ণের এই সাঙ্কেতিক অর্থকে বড় করিয়া তুলিলে যেমন রামায়ণের রসরূপকে বিকৃত করা হয়, সেইরূপ রক্তকরবীর মধ্যে সাঙ্কেতিক অর্থকে বড় করিয়া তুলিলে রক্তকরবী নাটককে রসরূপে দেখা যাইবে না। [রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সঙ্কেত' ও 'রূপক' এই কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা রূপকের স্থলে এ ক্ষেত্রে সঙ্কেত বুঝিব।]

বারোয়ারীর প্রবীণ মণ্ডলী রামায়ণকে কি ভাবে দেখেন জানি না, কিন্তু রক্তকরবী নাটককে কবির নির্দেশ সত্ত্বেও মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের কাহিনী বলিয়া দেখিতে আপত্তি করেন। তাঁহাদিগকে প্রথম হইতেই প্রতীকে পাইয়া বসে। রামায়ণ হইতে রাম, রাবণ, সীতা, স্বর্ণলঙ্কাপুরী প্রভৃতি শব্দগুলির সাঙ্কেতিক অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া এবং সোনার হরিণের লোভ, বানরের দ্বারা লেজে করিয়া স্বর্ণলঙ্কার দাহন প্রভৃতি ঘটনাগুলির গূঢ় তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া রামায়ণকে বুঝিবার চেষ্টা করার মত রক্তকরবী নাটক হইতেও বিভিন্ন সাঙ্কেতিক অর্থ বাহির করিয়া রক্তকরবী নাটককে তাঁহারা দেখিতে চান। ইহাতে রক্তকরবী নাটকের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেলেও এই দেখাকে রসিকের দেখা বলিব না। রামায়ণ হইতে রস পাইতে গেলে, রামায়ণের সকল সাঙ্কেতিক অর্থকে গৌণ করিয়া যেমন সেখানে মানুষের সুখ-দুঃখের বিরহ-মিলনের কাহিনীকে অনুসরণ করিতে হইবে, সেইরূপ রক্তকরবী নাটক হইতেও রসগ্রহণ করিতে হইলে, সেখানে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীটিকে

মুখ্য করিয়া তুলিতে হইবে। রামায়ণের কবি রামায়ণ-পাঠ সম্বন্ধে পাঠকের এমন একটি সমস্যার কথা কল্পনা করেন নাই। কিন্তু আধুনিক কালের কবিকে আমাদের বুদ্ধির অভিমানের জন্যই আসরে নামিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে।

সাঙ্কেতিকতার দিক হইতে দেখিতে গিয়া নাট্যবস্তুকে একদিকে যেমন সংকীর্ণ করিয়া দেখা হয়, শিল্প-ভঙ্গীকেও সেইরূপে পরিচিত করিতে গিয়া রক্তকরবী নাটককে রূপক-নাটক সাঙ্কেতিক-নাটক প্রভৃতি নাম দিতে হয়। ইহাতে নাটকটির যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। অথচ সাধারণ ঘটনাপ্রধান নাটকের পর্যায়ে রক্তকরবীকে গণ্য করা যায় না। সেগুলি হইতে এই নাটকটির পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ঘটনার স্বল্পতা, বাচন ভঙ্গীর গীতিধর্মিতা, বহির্দ্বন্দ্বের বর্জন, চরিত্র চিত্রণের বিশিষ্টতা এবং গূঢ়ার্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় সংলাপ নাটকটিকে একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ দান করিয়াছে। নাট্যবস্তুর বিশিষ্টতার জন্যই শিল্পরূপে এই বিশিষ্টতা আসিয়াছে। নাট্য-কাহিনীর বিশিষ্টতাকে ধরিতে না পারিলে এই শিল্প-ভঙ্গীর বিশিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না। জালের পর্দার আবরণ, রঞ্জনের নেপথ্য-বিচরণ, রাজার অন্তরালে অবস্থিতি, প্রভৃতি বিষয়গুলির তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না। রূপক-নাটকের দোহাই দিয়া আমরা নাটকটিকে বুঝিবার পক্ষে সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিই, বোধের জড়তা বুদ্ধির অভিমানে চাপা পড়িয়া যায়।

রক্তকরবী নাটককে বুঝিতে হইলে আগে তাহার মধ্য হইতে মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের কাহিনীটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। দেখিতে হইবে সেই কাহিনীটিকে কি ভাবে শিল্পরূপ দেওয়া হইতেছে। তাহা হইলে দেখিতে পাইব কাহিনীর বিশিষ্টতার জন্যই শিল্পরূপে একটি বিশিষ্টতা আসিয়াছে। তখন এই বিশিষ্ট শিল্প-ভঙ্গীর যদি কোন আলঙ্কারিক সংজ্ঞা মিলে তাহা হইলে উত্তম, আর যদি তাহা না পাওয়া যায়, তবে তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু কোন মতেই পূর্ব হইতে একটি ছাঁচে ফেলিয়া নাটকটি ব্যাখ্যা করা চলে না। সে ক্ষেত্রে রসাস্বাদনে বিভ্রম উপস্থিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্য-ভঙ্গী

রক্তকরবীর নাট্যকাহিনীটি অবতারণা করিবার পূর্বে একটি ভূমিকা করিতে চাই। এখানে ভূমিকাটি অবান্তর হইবে না, কারণ নাট্য-কাহিনীর যে বিশিষ্টতা নিরূপণ করিতে চাই, ইহার দ্বারা তাহা সহজবোধ্য হইবে।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় নাটকও একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে জীবনের কথাকে আমাদের নিকট উপস্থিত করে। এই উপস্থাপনের ভঙ্গীটি যেমন নাটকের পক্ষে বিশিষ্ট, তেমনি যে জীবন-কথাকে নাট্য-সাহিত্য অবলম্বন করে সেই জীবন-কথাটিও বিশিষ্ট।

আমাদের জীবনে কাব্য ও নাটক এই উভয়ই দেখা যায়। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, দ্বন্দ্ব-মুখর জীবনের প্রেরণাকে অস্বীকার করিয়া কবি শুধুমাত্র স্বাভাবিক স্ব-চ্ছন্দ জীবন হইতেই রস-প্রেরণা গ্রহণ করেন না। কবির শিল্প-প্রেরণার মূলেও জীবনের দ্বন্দ্ব-মুখরতা থাকিতে পারে, কিন্তু কবির কাব্যে জীবন-দ্বন্দ্বের কোন অনুকৃতি থাকে না। কবি আপনার কবি-চেতনায় জীবনের দ্বন্দ্ব-রূপটির ভাব-নির্যাস শোধন করিয়া লইয়া কবিতার আকারে তাহাকে উপস্থিত করেন। ইহাতে বাস্তবজীবনের কোন অনুকৃতি থাকে না, কবির উপলব্ধির একটা প্রকাশ থাকে মাত্র। কবি যেখানে আপনার উপলব্ধির সহিত বাস্তবজীবনেরও একটা অনুকৃতি দিবার প্রয়াস পান, সেখানে তাহা আখ্যান-মূলক কাব্যের রূপ লাভ করে।

নাটকের ক্ষেত্রে দেখি, নাট্যকার জীবনের দ্বন্দ্ব-রূপটিকেই চিত্রিত করিতে চাহেন। তিনি তাঁহার রস-চৈতন্যের উপলব্ধিটিকে প্রকাশ না করিয়া, তাঁহার রস-চেতনায় যে উপলব্ধিটি ধরা পড়িয়াছে, সেই উপলব্ধিটিকে আমাদের মধ্যে জাগাইবার জন্য জীবনের একটি চিত্র উপস্থিত করেন। ঋষি আরিষ্টট্‌ল্ এই শিল্পরীতির একটি সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। সূত্রটি নাটক রচনার তত্ত্ব হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহার মূল কথাটি এই যে, অভিনয়ের দ্বারা ঘটনার পারম্পর্য-বিধানে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশে জীবনের একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ দেওয়াই নাট্যশিল্পের রীতি।

'ঘটনার পারম্পর্য বিধান'—নাটক সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান। প্রতি-কূল শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইলে জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

ইহাতে জীবন বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং সেই সকল অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বন্দ্বমুক্ত হইবার চেষ্টা করে। এই অবস্থাগুলি কতকগুলি ঘটনার সৃষ্টি করে এবং কতকগুলি ঘটনার সূচনা করে। নাটকে অভিনয়ের দ্বারা এই সকল ঘটনাগুলিকে ঘটানো হয় এবং ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেলে দ্বন্দ্বের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া নাট্যবস্তুকে আমাদের রসাস্বাদনের বিষয় করিয়া তোলে। এই ঘটনাগুলি যেমন-তেমনভাবে ঘটানো চলে না। ঘটনাগুলির পারম্পর্য বিধানে জীবনের একটা গতিশীল-সম্পূর্ণরূপ যাহাতে ফুটিয়া উঠে সেইভাবে ঘটনার বিন্যাস প্রয়োজন। এই ঘটনা সংস্থান ও ঘটনা বিন্যাসে নাট্যকারের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়।

এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম, সাধারণভাবে সকল নাট্য-সাহিত্যের প্রতিই তাহা প্রযোজ্য। সাধারণতঃ জীবনের দ্বন্দ্ব যে ঘটনার সৃষ্টি করে, সেই ঘটনাকেই নাটকে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু জীবনের এমন অনেক ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে জীবনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব বাহিরের কোন ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না; তাহা মনের মধ্যে উদিত হইয়া মনের মধ্যেই সমাপ্তি লাভ করে। সেখানে জীবন-দ্বন্দ্বটি প্রকাশের জন্য কোন বাহ্যিক ঘটনার অপেক্ষায় থাকে না। সেক্ষেত্রে কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই দ্বন্দ্বটি স্ফূর্তি লাভ করে। এই মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়াই জীবনদ্বন্দ্বের প্রকাশ, বিকাশ ও পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, the human soul has its inner drama। এই inner drama,—অন্তর্নাটক বা মনোজীবনের নাটক সকল ক্ষেত্রে ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না। আমাদের জীবনে এই inner dramaর একটি বিশেষ স্থান আছে। বিশেষতঃ, জীবনে যখন সূক্ষ্ম মননশীলতার প্রাধান্য ঘটে এবং জীবন একান্তভাবে মনোধর্মী হইয়া উঠে, তখন প্রতিকূল শক্তির বাধায় প্রতিহত হইলে জীবনে এই inner dramaর-ই সৃষ্টি হয়। সেখানে আমাদের মনের মধ্যেই বহু ঘটনার সৃষ্টি হইতে থাকে। এই মানসিক ঘটনাগুলির খুব অল্পই বাহিরে প্রকাশ পায়; তাই বাহিরের ঘটনা দেখিয়া সে ক্ষেত্রে জীবন-দ্বন্দ্বের বিকাশটিকে বুঝিতে পারা যায় না। একটি ঘটনার সহিত আর একটি ঘটনার সহসা কোন ন্যায়সঙ্গত যোগ-সূত্র আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। সাধারণ ঘটনাপ্রধান নাটকে যেমন একটি ঘটনার মধ্যে পরবর্তী অপর একটি বা অনেকগুলি ঘটনার সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত থাকে, এবং ঘটনা পরম্পরাকে অনুসরণ করিলেই আমরা নাট্যবস্তুটির

সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারি, এ ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। এখানে প্রায়শঃই একটি ঘটনার সহিত আর একটি ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, দুইটি ঘটনার মধ্যে বহু অপ্রকাশিত ঘটনা থাকিয়া যায়। সেই অপ্রকাশিত ঘটনাগুলি চরিত্রের মনোজীবনের ঘটনা, অর্থাৎ ঘটনাগুলি মানসিক, এগুলিকে আভাসে ইঙ্গিতে জানানো হয় মাত্র, বাস্তব ঘটনার সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে জানাইবার উপায় নাই। সেগুলির কোন বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশই নাই। সেগুলি inner dramaর উপকরণ। এই inner dramaটিকে বুঝিতে না পারিলে এক্ষেত্রে নাটকের ঘটনাবলী অনুসরণ করা যায় না।

এই inner dramaকে শিল্পী যখন একটি নাট্যরূপ দিতে চাহেন, তখন সাধারণ নাটকের মত তিনি ঘটনা সংস্থান করিতে পারেন না। তাঁহাকে বিশেষ কৌশলে বিভিন্ন ব্যঞ্জনার দ্বারা মানসিক ঘটনাগুলিকে উপস্থিত করিতে হয়।

অনেকে হয়তো এইখানে এই বলিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন যে, এই inner dramaকেও উপযুক্ত শিল্পী নিপুণ হস্তে ঘটনা সৃষ্টি করিয়াই প্রকাশ করিতে পারেন। পরন্তু, অভিনয় করিয়া না দেখাইলে যখন নাটক হইবে না, তখন অভিনয়ের জন্যই ঘটনার সৃষ্টি করিতে হইবে, শুধুমাত্র চরিত্রের মুখে দীর্ঘ বিবৃতির দ্বারা বুঝাইলে তাহা চলিবে না। দর্শক যাহা গ্রহণ করিবে, তাহা রঙ্গমঞ্চের উপর যথার্থ অভিনয় হইতেই গ্রহণ করিবে, তাহা কেবলমাত্র আবৃত্তি (recitation) হইলে চলিবে না।

ঠিক কথা। Inner drama-কেও অভিনয়ের দ্বারা দেখাইতে হইবে। অভিনয়ের জন্য ঘটনা সংস্থানের প্রয়োজন। Inner dramaর রূপায়ণেও ঘটনা সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ঘটনার পরিমাণ অল্প, ঘটনার প্রকৃতিও বিশিষ্ট ও ব্যঞ্জনাময়। সেখানে দুইটি ঘটনার মধ্যে বহু ঘটনার ব্যবধান থাকিয়া যায়। যে ঘটনাগুলি মানসিক, সেগুলির তো বাহিরে কোন প্রকাশ্য রূপ নাই। সেগুলিকে তাই আভাস ইঙ্গিতে বিশেষ উপায়ে জানাইতে হয়। সাধারণভাবে ঘটনার সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করিতে গেলে inner dramaর সূক্ষ্ম আবেদনটি নষ্ট হইয়া যায়।

এখন, আমাদের জীবনে এই inner dramaর অবকাশ কোথায় তাহা একটু বুঝিয়া দেখা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা যত মনোধর্মী হইয়া উঠি,

আমাদের মধ্যে এই inner drama তত অধিকস্থান জুড়িয়া বসে। মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তিকে অনুসরণ করিলে দেখা যায়, মানুষের মনের ক্রমশঃই সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। দেহের দিক দিয়া অভিব্যক্তির ধারা একস্থানে আসিয়া একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে, মনের দিক দিয়া এই অভিব্যক্তি আরও সম্ভাবনার পথে চলিতেছে। যে মানুষ পূর্বে শুধুমাত্র দৈহিক জীবন-যাপন করিত, সে আজ অতিমাত্রায় মানসিক জীবন যাপন করিতেছে। আমাদের মধ্যে এই মনোজীবনের প্রাধান্য ঘটায় পৃথিবীর সহিত যোগে যে বিভিন্ন শক্তি-গুলির মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হয়, সেই সংঘাতগুলিতে আমাদের জীবনে কতক-গুলি মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় মাত্র। যে বর্বর মানুষ ইতিপূর্বে জীবনের সহিত যোগে বিরোধের সম্মুখীন হইলে বিভিন্ন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা সেই বিরোধের সমাধান করিত, সেই মানুষই আজ মনোধর্মী হইয়া উঠিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। এখন বিরোধের ফলে তাহার মধ্যে কতকগুলি মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মাত্র। সে এখন আর কথায় কথায় শত্রুপক্ষকে আঁচড়াইতে কামড়াইতে যায় না, কথায় কথায় তলোয়ার খুলিয়া বীরত্ব প্রকাশ করে না, তাহার মধ্যে মনোজীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার যে আত্মপ্রকাশ হয় না তাহা নহে, কিন্তু জীবনে এই ঘটনার সংখ্যা কমিয়া যায়। অথবা ঘটনার মধ্য দিয়া যখন আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন সেই ঘটনার অন্তরালে বহু মানসিক ঘটনা ঘটিয়া যায়।

হয়তো কাহারও সহিত কোন কারণে কলহের সৃষ্টি হইল। যদি স্থূল মনোধর্মে থাকি, তাহা হইলে তখনই হাত গুটাইয়া মারামারি করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দিই। তখন সংগ্রামে জয়লাভ করিলেই বিরোধের অবসান হয়। কিন্তু যখন সূক্ষ্ম মনোধর্মে থাকি, তখন হয়তো দেখা যায় যে বাহিরের ঘটনার মধ্য দিয়াই যাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে, মনের মধ্যে তাহাকে পরিণতি বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না। সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াও দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। তখন ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরেও মনের মধ্যে নূতন করিয়া মানসিক ঘটনার উদ্ভব হয়। অপ্রত্যক্ষভাবে মনের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে; নূতন করিয়া দ্বন্দ্বের সূচনা হয় এবং তাহার বিকাশ হইতে থাকে। প্রতিপক্ষকে সামনে কল্পনা করিয়া তাহার সহিত কত তর্ক-বিতর্ক করিতে থাকি এবং পরিশেষে হয়তো মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া পড়ি। এই

অনুতাপ হয়তো পরে একটি বাহিরের ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। যাহাকে পরাস্ত করিয়া জীবনের রঙ্গমঞ্চ জয়ের গৌরবে ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই রঙ্গমঞ্চেই পুনরায় অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসি। পরাজিতকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এখন পূর্বের সংগ্রাম ও পরের ক্ষমা-প্রার্থনা, এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অন্তর্বর্তী কোন ঘটনার অভাবে সহসা কোন ন্যায়-সঙ্গত যোগসূত্র (Logical link) খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যদি না মানসিক ঘটনাগুলিকে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের জীবনে এমন অনেক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন কোন ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদের আত্মপ্রকাশ হয় না; ঘটনার সৃষ্টি না করিয়া আমরা ঘটনাকে অতিক্রম করিয়া যাই। আমাদের মনোধর্মের বিশিষ্টতার জন্যই আমাদের জীবনে অনেক ঘটনার সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়া যায়।

আমাদের জীবনে এই যে প্রত্যক্ষ ঘটনার স্বল্পতার কথা বলিলাম, ইহা শুধুমাত্র আমাদের মনোজীবনের একটি evolution-এর জন্যই হয় নাই। বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারগুলি আমাদের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনকে যে-ভাবে প্রভাবিত করিতেছে, তাহাতেও আমরা ঘটনাকে বহু ক্ষেত্রে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের দানগুলি আমাদের জীবনের দূর দিগন্তকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটে আনিয়া দিতেছে। পূর্বে আমাদের জীবন যখন দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই জীবনের খণ্ড প্রকাশগুলি আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিত। তখন একগ্রাম হইতে আর একগ্রামে যাওয়ার বিষয়টিই জীবনে বহু বিচিত্র খণ্ড খণ্ড ঘটনার সৃষ্টি করিতে পারিত। শেরসাহ্ যখন দিল্লী হইতে পূর্বদেশে যাত্রা সুরু করিলেন তখন সেই যাত্রার কত আয়োজন, কত উপকরণ এবং সে কী-বিপুল বিস্তৃতি লইয়া জীবনের বিচিত্র প্রকাশ। শ্রমিক আসিল পথে চলিবার বহুল উপকরণ বহন করিয়া; পদাতিক আসিল, অশ্বারোহী আসিল, হাতীর উপর হাওদা সাজাইয়া রাজার যোগ্য আসন তৈয়ারী হইল, দলে দলে অনুচরেরা আসিয়া যোগ দিল এবং একটি বিরাট গোষ্ঠী লইয়া যাত্রা হইল সুরু। পথের মধ্যে মধ্যে তাঁবু ফেলিতে ফেলিতে, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে করিতে দীর্ঘদিন পরে শেরসাহ্ গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছিলেন। এই যাত্রাটি বহু ঘটনার সৃষ্টি করিয়া শেরসাহের জীবনের অনেকখানি অংশ অধিকার করিয়া রহিল। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে

দেশ ও কাল বহুল পরিমাণে আমাদের করতলগত হইয়াছে। এখন নিমেষের মধ্যে আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের সংযোগ স্থাপন করিতে পারিতেছি। জীবন যেখানে সুদীর্ঘ কয়েক মাসের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত সেখানে জীবনের প্রকাশ কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে আমরা শুধুমাত্র গোলকরূপে কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হই না, কয়েক দিনের মধ্যে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসিয়া তাহাকে গোলকরূপে ব্যবহারও করিয়া থাকি। আজ পৃথিবী তাহার দুস্তরতা লইয়া আমাদের জীবনকে পূর্বের মত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বহুধা করিয়া ফেলিতেছে না, পরন্তু আজ পৃথিবীকেই করায়ত্ত করিয়া আমাদের জীবন পৃথিবীকে ছাপাইয়া যাইতেছে। পৃথিবী আজ যে গতিতে নিজের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতেছে, আমাদের জীবনকে বিজ্ঞান তাহা অপেক্ষা দ্রুতগতি দান করিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ যখন বহুদূর হইতে নিমেষের মধ্যে প্রিয়ার আহ্বান ভাসিয়া আসে, তখন তাহারই উত্তরে পুষ্প নিবেদন করিতে গিয়া পৃথিবীর রজনীগন্ধার বিকাশের লগ্নটিকে বড়ই বিলম্বিত বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের গতিটি বাড়াইয়া দিয়াছে। এই দ্রুত-গতিতে চলিতে গিয়া জীবনকে আজ রহিয়া সহিয়া, চাখিয়া চাখিয়া ভোগ করিবার উপায় নাই। আজ প্রাণের পাত্রে জীবন-রসকে আরও ঘন করিয়া concentrated formএ পান করিতে হইবে। আজ জীবনকে সহস্র রূপে গ্রহণ করিবার অবকাশ নাই, এখন সেই সহস্র রূপকে একটি মাত্র ভাবনির্যাসের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা জীবনভোগের দীনতার পরিচয় নয়। আজ 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা'-ই আমাদের জীবনে রসোপলব্ধির ভূমিকা রচনা করিয়া দিতেছে। আজ আমাদের রক্তে সমুদ্রের তরঙ্গ নৃত্য, অরণ্যের ব্যাকুল স্পন্দন। আজ কবির বাণী তাই—'শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও।' আজ সতরঞ্চ বিছাইয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরিয়া দাবা খেলিবার সময় নাই, আজ ঝঞ্ঝা-মদ-রসে আমাদের জীবনকে সিক্ত করিয়া মত্তগতিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বস্তুজগতকে যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছে, আমাদের মনোজীবনকেও সেইরূপ প্রভাবিত করিয়াছে। আমাদের মন আজ গতানুগতিক পৃথিবীকে এবং সাধারণ ভাববস্তুকে অবলম্বন করিয়া

তৃপ্ত থাকিতেছে না। এখন বিভিন্ন অভিনব বিষয়কে সে আয়ত্ত করিতেছে। তাহার জিজ্ঞাসা অভাবনীয়কে স্পর্শ করিতেছে, তাহার লীলা অসম্ভবকে কল্পনা করিতেছে, তাহার ভোগ দুষ্প্রাপ্যকে অধিকার করিতেছে। এখন আমাদের মন পরমাণুর রহস্য চিন্তায় মগ্ন; অনন্ত আকাশ হইতে ভ্রাম্যমাণ কোনও তারকা সহসা পৃথিবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার কি অবস্থা হইবে তাহারই চিন্তায় সে মুহ্যমান। মঙ্গলগ্রহে যাইতে হইলে আকাশ-যানটির কী পরিমাণ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, তাহাই তাহার একটি অন্যতম সমস্যা। আজ বৈজ্ঞানিকরা আমাদের মনের নূতন খোরাক দিতেছেন। ইহাতে আমরা অভিনব ভাববস্তুকে রূপে লাভ করিবার কল্পনা করিতেছি। আজ আর পৃথিবীর পুরাতন পরিবেশে পৃথিবীর প্রিয়াকে লইয়া মনের তৃষ্ণা মিটিতেছে না; মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মঙ্গলগ্রহের প্রেয়সীকে দেখিতে চাহিতেছি এবং তাহার জন্য মনে হয়তো বেদনাও জাগাইয়া তুলিতেছি। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ আজ নূতন গতি-শক্তির কথা বলিতেছেন, 'টাইম-মেশিনের' কল্পনা করিতেছেন। যে-আণবিক শক্তি একদা কল্পনার বিষয় ছিল তাহা তো আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে এবং সেই বাস্তবই আবার নূতনতর বিভিন্ন কল্পনা জাগাইয়া তুলিতেছে।

এইরূপে দেখি পূর্বের গতানুগতিক বিষয় ছাড়িয়া আমাদের মনোজীবনের যেমন নূতন নূতন কল্পনার ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনই সেই সকল কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের এক অভিনব বস্তুজগত সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিশিষ্ট মনোজগত ও বিশিষ্ট বস্তুজগত লইয়া আমাদের যে জীবন, সেই জীবনের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণ হইল এই যে আমাদের জীবন ক্রমশঃ concentrated হইয়া আসিতেছে। জীবনকে আমরা পূর্বের চেয়েও ঘনীভূতভাবে লাভ করিতেছি। ইহাতে আমাদের জীবনযাপনটি পূর্বের ন্যায় ঘটনাপ্রধান হইয়া উঠিতেছে না।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ঘটনা না ঘটাইয়া কি কোন প্রকার আত্ম-প্রকাশ (জীবনের প্রকাশ) সম্ভব? প্রকাশ মানেই তো কোন না কোন ঘটনার সৃষ্টি। কাজেই আত্মপ্রকাশ স্থূলভাবেই হউক আর সূক্ষ্মভাবেই হউক, ঘটনার অবতারণা তো জীবনে হইবেই।

ঘটনা না ঘটাইয়া কোনরূপ প্রকাশ সিদ্ধ হয় না, এ কথা যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞান

আজ আমাদের জীবনের পরিবেশ যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে, তাহাতে আমরা যে সকল ঘটনার অধীন হইতেছি সেগুলির মধ্যে বহু ঘটনা আমাদের গোচরীভূত হইতেছে না, অর্থাৎ আমরা বহু ঘটনার সমষ্টিগত ফলকে একটি ঘটনার মধ্যে লাভ করিতেছি। আবার ঘটনা না ঘটাইয়াও জীবনের একটি বিকাশ সাধিত হইতে পারে। জীবনের বিকাশটি হয়তো বাহিরের ঘটনায় প্রকাশ না পাইয়া মনের মধ্যেই ঘটিয়া যায় এবং সেই বিকাশের শেষ পরিণতিটি হয়তো ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। বিকাশ ও প্রকাশ, এই কথা দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রকাশ অর্থে কোন একটি রূপ লাভকে বুঝায়, বিকাশ অর্থে একরূপ হইতে অন্য আর একটি রূপে জীবনের অতিক্রমণকে বুঝায়। এই রূপান্তর লাভের মধ্যেও প্রকাশের কথাটি আছে, কিন্তু বিকাশ কথাটিতে শুধুমাত্র প্রকাশের চেয়েও আরও কিছু বেশী বুঝায়। জীবনের একরূপ হইতে অন্যরূপে যাওয়াকেই জীবনের বিকাশ বলি। এই একরূপ হইতে অন্যরূপে যাওয়ার মধ্যে জীবনের বহু রূপ-প্রকাশ ঘটিতে পারে আবার না-ও পারে। প্রথম ক্ষেত্রে জীবনের বিকাশটি বহু প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, যে ঘটনাগুলিকে বিজ্ঞান যথাসাধ্য দৃষ্টির আড়ালে সরাইয়া রাখিতেছে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জীবনের বিকাশটির শেষ পরিণতিটিই শুধুমাত্র রূপ লাভ করে এবং একরূপ হইতে অন্যরূপে জীবনের এই অতিক্রমণটি একটি মানসিক বিপর্যয় (mental disturbance) রূপে সংঘটিত হইয়া থাকে। বাহিরের কোন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া তাহা বাস্তবরূপ লাভ করে না।

প্রত্যক্ষ ঘটনার সৃষ্টি না করিয়া একটি মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জীবনের এই যে একরূপ হইতে অন্যরূপে অতিক্রমণ, ইহাই inner drama বা অন্তর্নাট্যের বিষয়। সাধারণ ঘটনা-প্রধান নাটকে এই inner dramaটিকে দেখানো হয় না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর নাটক আছে যাহাতে এই অন্তর্নাট্যই নাটকের অবলম্বনীয় বিষয়। সে সকল নাটকে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনা থাকে সেই ঘটনাগুলি আপনাতে আপনি পূর্ণ নহে। অন্তর্নাট্যকে বাদ দিলে ঘটনাগুলি বুঝিতে পারা যায় না। সেক্ষেত্রে অন্তর্নাট্যই নাট্যবস্তুর অনেকখানি অংশ অধিকার করিয়া থাকে। অর্থাৎ নাটকের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহার অধিকাংশই অন্তর্নাট্যের অনুষ্ঠেয় বিষয়, প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে যেটুকু প্রকাশ পায় তাহাতে নাট্যবস্তুর সম্পূর্ণ পরিচয় নাই। এই অন্তর্নাট্যকে

বিভিন্ন কৌশলে উপস্থিত করা হয়। এই শ্রেণীর নাটক দেখিতে তাই সূক্ষ্মরস-দৃষ্টির প্রয়োজন।

রক্তকরবী নাটকটি এমনই একটি নাটক। ইহা রূপক নাটক নহে, সাধারণ ঘটনাপ্রধান নাটকও নহে; ইহার মধ্য দিয়া আমাদের এই মানব জীবনের একটি বিশিষ্ট দ্বন্দ্ব-রূপ একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী লাভ করিয়াছে। এই বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গীটিকে বুঝিতে গেলে দ্বন্দ্ব-রূপের বিশিষ্টতাকে তথা রক্তকরবীর নাট্য-কাহিনীটিকে আগে উদ্ধার করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্য-কাহিনী

ঈশানী পাড়ায় নন্দিনী নামে একটি মানবী কন্যা ছিল। যেমন ছিল তাহার রূপ, তেমনি ছিল তাহার প্রাণের প্রাচুর্য। সে ছিল যেন মূর্তিমতী আনন্দ, তাই বুঝি তাহার নন্দিনী নাম। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, পৃথিবীর প্রাণ-ভরা খুশি-খানি সে যেন নিজের সর্বাঙ্গে টানিয়া লইয়াছে। ঈশানী পাড়ার সকলেই এই নন্দিনীকে জানে, তাহাকে 'নন্দিন' বলিয়া ডাকে; তাহার সহিত সকলেরই যেন একটি সহজ আত্মীয়তা আছে। পাশের গ্রামের লোকেরাও তাহাকে জানিত 'ঈশানী-পাড়ার নন্দিন' বলিয়া।

গ্রামের ছেলেদের মনে এই নন্দিনী তো নিত্য স্বপ্নলোক সৃজন করিয়া রাখে। নন্দিনীকে দেখিয়া তাহাদের রঙ্গীন বাসনা অসম্ভবের আকাশে পক্ষবিস্তার করে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য সকলেই স্ব-স্ব পৌরুষের পরিচয় দিতে চায়। তাহার মুখের একটুখানি অনুকূল হাসির জন্য তাহাদের কত দুঃসাধ্য আয়োজন।

কঙ্কু ছেলেটি বড়ো লাজুক। নন্দিনীর একটু ইশারাতেই তাহার বুকের রক্ত নাচিয়া উঠিত, কিন্তু সাহস করিয়া নন্দিনীর কাছে আসিতে পারিত না। নন্দিনী যখন ঘাটে জল আনিতে যাইত, তখন ঘাটের ঢালু পাড়ির উপর বসিয়া থাকিত। ভান করিত যেন তীর তৈয়ারী করিবার জন্য শর ভাঙ্গিতে আসিয়াছে। তাহার এই ছলনাটি নন্দিনীর উপভোগের বিষয় ছিল; দুষ্টামি করিয়া নন্দিনী তাহাকে কত দিন দুঃখ দিয়াছে।

নন্দিনী পুরুষের বাসনারাজ্যের মধ্যমণি। পুরুষের বাসনাকে আকর্ষণ করিয়া সে আপনার নারীধর্ম অনুভব করে; তাহাকে ঘিরিয়া পুরুষের উচ্ছ্বসিত হৃদয়বৃত্তির তরঙ্গ-কল্লোল অনুভব করিয়া হয়তো অন্তরে অন্তরে সে গর্বিতা। তাহাকে লইয়া গ্রামের ছেলেদের মধ্যে হার-জিতের খেলা। বরণমালা হাতে করিয়া এই মধুর রমণী স্মিতহাস্যে অপেক্ষা করিয়া থাকে পুরুষশ্রেষ্ঠের জন্য—যে পুরুষ যৌবনের উদ্দাম রঞ্জিত বাসনায় সকলকে পরাস্ত করিয়া, সকল-প্রকার বাধাবিঘ্ন অবহেলায় অতিক্রম করিয়া নারীকে সবল বাহুর মধ্যে আকর্ষণ করে। নন্দিনী নারী-শ্রেষ্ঠা; এই নারীশ্রেষ্ঠা বীরভোগ্যা। এই বীর পুরুষটির নাম রঞ্জন। নন্দিনীর মুখে এই বীর রঞ্জনের যৌবন-শক্তির পরিচয় পাই। নন্দিনী বলে, "দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে

দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার-জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে।"

রঞ্জন নন্দিনীকে আদর করিয়া ডাকে, 'রক্তকরবী'। রক্তকরবী নামে রঞ্জন নন্দিনীকে কেন ডাকে তাহা রঞ্জনই জানে। হয়তো রক্তকরবীর রক্তিমা, সুষমা ও লাবণ্যের প্রতিরূপ সে নন্দিনীর মধ্যে দেখিয়াছে। হয়তো 'রক্তকরবী' এই আহ্বানে সে তাহার ভালো লাগাকে, তাহার প্রেমানুভূতিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। যাহাই হউক, নন্দিনীর মনে হয়, রঞ্জনের ভাল-বাসার রঙ্ বাসনা-রঙীন। রক্তকরবী ফুলের সান্নিধ্যে আসিয়া নন্দিনী সেই রঙীন প্রেমকে অনুভব করিতে চায়।

নন্দিনীকে লইয়া যাহারা হারজিতের খেলা খেলিতেছিল, রঞ্জনের কাছে তাহারা সকলেই নগণ্য হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেই বাজীখেলার ভিড়ের মধ্যে একজনকে নন্দিনীর মনে আছে। হারজিতের খেলায় সেও মাতিয়াছিল, কিন্তু খেলা শেষ হইবার পূর্বেই কী মনে করিয়া সে ভিড়ের মধ্য হইতে চলিয়া গেল। তাহার বিদায়কালীন চোখের চাওয়ায় কী একটি গভীর অর্থ নিহিত ছিল, যাহা নন্দিনী বুঝিতে পারে নাই। পুরুষের যে চাহনিতে নন্দিনী অভ্যস্ত, এ চাহনি, সে চাহনি নয়। ইহার সহিত নন্দিনীর পরিচয় নাই। এই দুর্বোধ্য চাহনিকে নন্দিনী ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু ভিড় ছাড়িয়া সে কোথায় চলিয়া গেল নন্দিনী তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। নন্দিনীর এই নীরব প্রেমিকটির নাম বিশু।

এই পর্যন্ত নন্দিনীর জীবনের একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়টি নন্দিনীর পল্লীজীবনের অধ্যায়। এখানে নন্দিনী সহজ আনন্দের ধর্মে সকলের সহিত যোগে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করিয়াছে, এখানে সে যে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিতা, সেখানে তাহার জীবনের প্রকাশে তাহার পরিপার্শ্বের আনুকূল্য রহিয়াছে।

ইহার পর নন্দিনীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইল। এখন দেখি নন্দিনীর জীবনে পল্লীর পরিবেশটি পাল্টাইয়া গিয়াছে। পল্লীজীবন ছাড়িয়া নন্দিনী যক্ষপুরীতে আসিয়াছে। এই যক্ষপুরীতে নন্দিনীর জীবন বিভিন্ন

বিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। এখানে আসিয়া সে পল্লীর সেই সহজ জীবনটিকে অনুভব করিতে পারিতেছে না। এখানকার নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা সবই আলাদা। এখানকার সমাজ-জীবনের সহিত নন্দিনী খাপ খাইল না। সে এখানে একটি অনিয়ম, একটি ব্যতিক্রম হইয়া রহিল। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সহিত, যক্ষপুরীর সমাজ-ব্যবস্থার সহিত তাহার নিত্য-সংঘর্ষ সুরু হইল।

প্রথমেই তো বিরোধ বাধিল রক্তকরবী ফুল লইয়া। রক্তকরবী ফুল নন্দিনীর অত্যন্ত প্রিয়। এই ফুলটির সান্নিধ্যে আসিয়া সে রঞ্জনের প্রেমকে, রঞ্জনের আহ্বানকে অনুভব করে। এই অর্থে রক্তকরবী তাহার কাছে রঞ্জনের প্রেমের প্রতীক। যক্ষপুরীতে আসিয়া সে রঞ্জনের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই রক্তকরবী ফুলের প্রতি তাহার অধিকতর ব্যাকুলতা। রক্তকরবী তাহার চাই-ই চাই।

রক্তকরবী ফুল যক্ষপুরীতে সহজে মিলে না। তাহার প্রতি যক্ষপুরীর অধিবাসীদেরও কোন আগ্রহ নাই। তবু প্রকৃতির নিয়মে এক জায়গায় জঞ্জালের পিছনে রক্তকরবীর একটি গাছ হইয়াছে। সেই গাছটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে কিশোর নামে একটি খোদাইকর বালক। নন্দিনীকে তাহার ভাল লাগে। নন্দিনীর ফরমাস খাটিয়া তাহার কিশোর মনটি পরিতৃপ্ত হয়। যক্ষপুরীর শাসন লঙ্ঘন করিয়া, কাজ কামাই করিয়া কিশোর নন্দিনীর জন্য ফুল আনিতে যায়। নন্দিনী কিশোরকে বলে, "এখানকার জানোয়ারেরা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়। তোদের এ দুঃখ আমি সইবো কি করে।" কিশোর বলে, "কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।"

তাহার পর যক্ষপুরীর অধ্যাপকের সঙ্গে নন্দিনীর দেখা। নন্দিনী তাহার কাছে যক্ষপুরীর স্বর্ণ-প্রীতির প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে। বিশেষ করিয়া যক্ষপুরীর রাজার নেপথ্য বিচরণের অর্থ বুঝিতে পারে না। নন্দিনী বলে,—

"তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।"

যক্ষপুরীর এই জালটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। জালের মধ্যে

যে থাকে সে একটি মানুষ, কিন্তু জালের বাহির হইতে তাহার যে পরিচয় তাহা হইল রাজার পরিচয়। জালটি যদি সরাইয়া লওয়া হয় তবে মানুষটির পরিচয় পাওয়া যাইবে, জালের বাহির হইতে মানুষটির পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তাহা হইলে এই জালের আবরণটিই কি রাজার নৃপতিত্বের পরিচায়ক?

যাহাই হউক, নন্দিনী যক্ষপুরীর নিয়ম-কানুন মানিতে চাহিল না। সে জালের বাধাকে অস্বীকার করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া রাজার সহিত মিলিতে চাহিল, যেখানে রাজা শুধুমাত্র রাজাই নয়, যেখানে সহজ মানুষ বলিয়া তাহার একটি পরিচয় আছে। নন্দিনী রাজাকে কেবলই অনুযোগ করিতে লাগিল,—

"পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে; তুমি বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই, মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ, সোনার পিণ্ড কি তোমার হাতের ওই আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের ক্ষেত। আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির ওপর পা দাও, পৃথিবী খুসি হয়ে উঠুক।"

কিন্তু রাজা যক্ষপুরীর জীবন ত্যাগ করিতে চাহে না। এখানে সে আপনার শক্তিকে একরকম করিয়া অনুভব করে। সোনা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সে আপনার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় অর্জন করিয়াছে, এই পরিচয়ে সে বিশেষ একটি গর্ব অনুভব করে। বিশু বলে, (নন্দিনী-প্রেমপ্রার্থী সেই বিশু; সে এখন যক্ষপুরীতে আসিয়া খোদাইকরের কাজ করিতেছে।) —"সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।" রাজাও তাই বলে; সে বলে, "আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।" সে বলে, "সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার নূপুর পরা ঝরণার মতো নাচতে পারে।"

এইভাবে রাজা যক্ষপুরীতে 'রাজা' হইয়া থাকিতে চায়। তাই সে কাহারও সহিত মানুষের পরিচয়ে দেখা করে না। জালের আবরণের ব্যবধানে সকলের সহিত তাহার কারবার চলে। যদি এইভাবেই রাজা জীবন কাটাইতে পারিত, তাহা হইলে কোন প্রশ্ন উঠিত না। কিন্তু রাজা শক্তি পাইয়াছে বটে, শান্তি পায় নাই। শক্তির সাধনা করিতে

করিতে রাজার মধ্যে একটা ক্লান্তির বোধ, একটা অশান্তির বোধ জাগিয়াছে এবং এই শক্তির সাধনার মধ্যে আর একটি চাওয়া রাজার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়াছে। রাজার জীবনের ক্লান্তি ও অশান্তি এই চাওয়াটিকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। রাজার এই চাওয়ার বিষয়টি হইল নন্দিনী।

রাজা বলে, "নন্দিনী তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙ্গে চুরে ফেলতে চাই।"

এই চাওয়ার প্রসঙ্গে রাজা রঞ্জনের উল্লেখ করে। রাজা জিজ্ঞাসা করে,—"বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা।"

নন্দিনী বলে, "হাঁ, ভালো লাগে।"

রাজা বলে, "রঞ্জনের মতোই?"

নন্দিনী উত্তর দেয়, "রঞ্জনকে দেখে আমার মন যে নাচে, সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।"

কিন্তু রাজা জানে কিসের অভাব তাহার। কিসের জন্য সে রঞ্জনের মতন করিয়া নন্দিনীকে আকর্ষণ করিতে পারে না। রাজা বিজ্ঞান-শক্তির সাধনা করিয়াছে, যৌবন-শক্তির সাধনা করে নাই। বিজ্ঞান-শক্তির দ্বারা যে মহিমা অর্জন করা যায়, নারী তাহাতেও আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু নারী আপনার মন-প্রাণকে, আপনার সমস্ত অস্তিত্বকে—যে অস্তিত্ব দেহের সৌন্দর্য, মনের মাধুর্য এবং প্রাণের প্রাচুর্য লইয়া অপরূপ,—তাহাকে সেই বিজ্ঞান-শক্তির কাছে নিবেদন করিতে পারে না। তাহা হইল যৌবন-শক্তি যাহার কাছে নারী আপনার সামগ্রিক সত্তাকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ। রাজা জীবনে এই যৌবন-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞান-শক্তিকে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাই তাহার এই আক্ষেপ। এই রাজার মধ্যে নন্দিনীর প্রতি একটি বাসনা জাগিয়াছে, তাই রাজা তাহার জীবনের অসঙ্গতির প্রতি সচেতন হইয়াছে। তাই রাজার মধ্যে সুরু হইয়াছে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে রাজার নৃপতিসত্তা, অপর দিকে নন্দিনীর প্রতি তাহার বাসনা। রাজা যে নৃপতি-সত্তায় শক্তি অর্জন করিয়াছে, সেই দিক হইতেই নন্দিনীকেও আয়ত্ত করিতে চায়। নন্দিনী বলে, "তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ,

তারপরে কেন এমন ছটফট করছ বুঝতে পারিনে।” রাজা বলে, “নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানায় মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি, কিন্তু যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।”

রাজাকে তাই দেখি যে, নন্দিনীর প্রতি তাহার একটা বাসনা জাগিয়াছে এবং জালের পর্দার আড়ালে থাকিয়াই সে নন্দিনীকে গ্রহণ করিতে চায়।

রাজা—জানালার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী—না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

রাজা—কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি, নন্দিনী?

নন্দিনী—তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

অর্থাৎ রাজাকে নন্দিনী তখনই স্বীকার করিতে পারে, যখন জালের ব্যবধান ঘুচাইয়া নন্দিনীকে রাজা লাভ করিতে চাহিবে।

সেই সময় আসিবে যখন রাজার সহিত রঞ্জনের দেখা হইবে।

রঞ্জনের সহিত দেখা হইলে রাজা রঞ্জনের মতন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন রাজা জালের ব্যবধান ঘুচাইয়া নন্দিনীকে লাভ করিতে পারিবে। রাজা কথাটিকে ঘুরাইয়া বলে, রাজা বলে, রঞ্জনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে নন্দিনীর প্রেম। নন্দিনীর প্রেম না পাইলে রঞ্জনের মতন পরিপূর্ণ জীবন পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া। নন্দিনী বলে, রঞ্জনকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে নন্দিনীর প্রেম কেমন করিয়া পাওয়া যায়। রাজা রঞ্জনের মতন না হইয়াই নন্দিনীর প্রেম লাভ করিতে চায়। নন্দিনী বলে, রঞ্জনের মতন না হইয়া উঠিলে নন্দিনীকে পাওয়া যাইবে না। এই কথাটি রাজা সহ্য করিতে পারে না। রাজা যে এখনও ‘রাজা’ হইয়াই আছে; এ কথা তাই সে বুঝিয়াও বুঝে না, অকারণে রাগিয়া যায়।

এখন জালের আবরণের মধ্যে যে আছে সে মানুষ, কিন্তু জালের আবরণের

বাহির হইতে তাহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইল রাজার পরিচয়। মধ্যে জালের আবরণ থাকাতে নন্দিনীর সহিত রাজার মিলন হইতেছে না। রাজা যখন রঞ্জনের সাক্ষাৎ পাইবে, তখন জালের আবরণ দূর হইয়া যাইবে। তখন রাজার সহিত নন্দিনীর মিলন হইবে। তাহা হইলে রাজা ও রঞ্জনের মধ্যে সম্বন্ধ কি? রাজাই কি এককালে নন্দিনীর জীবনের প্রথম অধ্যায়ে রঞ্জন-রূপে পরিচিত ছিল, এখন সেই রঞ্জন রাজা হইয়া উঠায় তাহার ও নন্দিনীর মধ্যে একটা জালের আবরণ পড়িয়া গিয়াছে? তাই কি নন্দিনীর সঙ্গে যক্ষপুরীতে রঞ্জনের বিচ্ছেদ? জালের দরজায় ঘা দিয়া নন্দিনী কি রাজার মধ্যে সেই রঞ্জনকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে? রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যে যে ব্যবধান পড়িয়া উঠিয়াছে, এই জালটি কি তাহারই পরিচায়ক? রঞ্জনের প্রতি প্রেমের শক্তিতে তাই বুঝি নন্দিনী জালের বাধা মানিতে চায় না, জাল ছিন্ন করিয়া রাজার মধ্য হইতে তাহার প্রাণের রঞ্জনকে উদ্ধার করিতে চায়। এই প্রেমের বিশ্বাসে তাই কি নন্দিনী ঘোষণা করিয়া গেল, "আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে—কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।"

*　　　　*

এদিকে যক্ষপুরীর সমাজজীবনের উপরেও নন্দিনীর প্রভাব পড়িতে সুরু করিয়াছে। যক্ষপুরীর বিকৃত জীবনের প্রতি নন্দিনীর অবজ্ঞা। রঞ্জন এই বিকৃত জীবনকে সহজ করিয়া তুলিতে পারে। নন্দিনী হইল সেই রঞ্জনের বাণী, তাহার অগ্রদূতী। রঞ্জন হইল নবীন জীবনের প্রভাত, নন্দিনী হইল সেই প্রভাতের শুকতারা। এই নন্দিনী যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ তাহাকে বুঝিতে পারিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কেহ তাহাকে বুঝিতে না পারিয়া তাহার প্রতি বিরূপ। কিশোর তো নন্দিনীর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আর বিশুর তো নন্দিনীকে দেখিয়া গান খুলিয়া গিয়াছে। নন্দিনী যে জীবনের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে যক্ষপুরীর জীবন বড়ই দীন। কেহ কেহ এই দীনতায় লজ্জা পায়, কেহ কেহ দীনতাকে বুঝিতে পারে না, নন্দিনীর উপর চটিয়া যায়। চন্দ্রা বলে, "এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও-যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায় এ আমরা দেখতে পারি নে।"

গোকুল বলে, "একটা কী মন্তর তোমার আছে, ফাঁদে ফেলেছে সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে।……

আমি কিছু তোমাকে বিশ্বাস করিনে। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান'।"

কিন্তু গোকুল, চন্দ্রা, ইহারা যাহাই বলুক, নন্দিনী যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহারা যক্ষপুরীর জীবনের বিকৃতির প্রতি প্রতিবাদ না করিয়া পারে না। নন্দিনীকে তাহারা যতই দেখে ততই যক্ষপুরীর জীবনের দীনতার প্রতি সচেতন হয়। ফাগুলাল বলে, "নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।"

নন্দিনীকে সবচেয়ে বেশী করিয়া জানিয়াছে খোদাইকর বিশু। চন্দ্রা বলে, "ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে। সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।" নন্দিনী বিশুর স্বপনতরীর নেয়ে। একদিন হারজিতের খেলা হইতে বিশু চলিয়া আসিয়াছিল, আজ যক্ষপুরীতে নূতন করিয়া নন্দিনীর সান্নিধ্যে আসিয়াছে, নন্দিনীকে নূতন করিয়া পাইয়াছে; পাইয়াছে তাহার যক্ষপুরীর দীন জীবনের মধ্যে, পাইয়াছে তাহার ব্যর্থ জীবনের বেদনার মধ্যে। নন্দিনীর প্রেমে তাহার জীবনের ধারা তাই আজ ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। 'তাহা হইল সত্যের পথ। তাই বিশুর কাছে যক্ষপুরীর বিকৃতি যত বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে এমনটি আর কাহারও কাছে নয়।

বিশু বলে, যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়।

বিশু বলে, আমাদের না আছে আকাশ না আছে অবকাশ।

চন্দ্রা নন্দিনীকে সহ্য করিতে না পারুক, বিশুর কথা সে যেন কিছুটা বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ ছুটির দিনে যখন ফাগুলাল লুকাইয়া রাখা মদের জন্য চন্দ্রার কাছে পীড়াপীড়ি করে, তখন চন্দ্রার মনে পড়িয়া যায় পল্লীজীবনের পার্বণের ছুটির কথা। বিশুকে তাই বলে চন্দ্রা, 'এসো না বেয়াই, পালাই আমরা।'

বিশু বলে, 'রাস্তা বন্ধ।'

রাস্তা কেন বন্ধ, সে কথাও বিশু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয়।

চন্দ্রা।—যাই বল বিশু বেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছুই বদল হয়নি।

বিশু।—হয়নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা।—কখ্খনো না।

বিশু।—আমি বলছি হাঁ। ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরও চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জানো না। অন্তর্ধামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা।—আচ্ছা বেশ, তা চলো না কেন এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু।—সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও, টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখী যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

এই স্বর্ণ-প্রীতিই যক্ষপুরীর মানুষদের যক্ষপুরীর জীবনের সহিত চিরস্থায়ী বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যাহারা যক্ষপুরীর বাহিরে পল্লীজীবনে ছিল, এই স্বর্ণ-প্রীতিই তাহাদিগকে যক্ষপুরীতে আনিয়াছে। বিশুর জীবনেও ইহাই ঘটিয়াছিল। হঠাৎ তীর-বিদ্ধ হইয়া উড়ন্ত পাখী যেমন মাটিতে পড়িয়া যায়, বিশুর স্ত্রীর স্বর্ণ-প্রীতি বিশুকে তেমনি করিয়া এই ধুলার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে।

বিশু ইহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করে, সর্দারকে ইহাদের কাছে স্বরূপে চিনাইবার চেষ্টা করে। ফাগুলাল কিছুটা বোঝে, যক্ষপুরীর পীড়ন সে অনুভব করিয়াছে। চন্দ্রা অতটা বুঝিতে পারে না। সর্দারের প্রতি তাহার অহেতুক প্রীতি, গোঁসাইকে দেখিলে এখনও প্রণাম করিতে ছোটে। গোঁসাইয়ের সহিত মিলিয়া সর্দার বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা রাখিবার আয়োজন করে।

আর বিশু আপনার আত্মজাগরণের দ্বারা ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যে আত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে চায়। এই আত্মজাগরণ যক্ষপুরীর লৌহ-জটিল-বন্ধের অন্তরালে একটি বিদ্রোহের ভূমিকা রচনা করিয়া দিতে থাকে।

বিশু বলে, এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতন দুঃখ আর নেই।

বিশু বলে, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে আকাঙ্খার যে দুঃখ তাই মানুষের।

* *

নন্দিনীর সহিত বিশুর দেখা হয়। নন্দিনী বলে, 'পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর সব বোজা।'

বিশু বলে, 'তুমি আমার দুখজাগানিয়া। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী, যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।'

নন্দিনী বলে, 'আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।'

* *

অতঃপর জানালার বাহির হইতে নন্দিনী আবার রাজাকে আহ্বান করে। নন্দিনীর সেই এক কথা—'ঘরের মধ্যে যেতে দাও।' রাজা স্বীকার করে না। কিন্তু রাজার মধ্যে একটা নূতন বোধের জাগরণ দেখা যায়। রাজা যেন বুঝিতে পারিয়াছে যে এতদিন ধরিয়া সে যাহাকে বাঁচিয়া থাকা বলিতেছিল তাহা মৃত্যুরই নামান্তর। পাথরের কোটরের মধ্যে তিন হাজার বছর ধরিয়া একটা ব্যাঙ্ যেমন বাঁচিয়া থাকে ইহা তেমনই। রাজা পাথরের আড়াল ভাঙিয়া ব্যাঙ্টিকে মুক্তি দিয়াছে। নন্দিনী রাজাকে বলিল, "আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।"

নন্দিনীর রঞ্জন লাভ, আর রাজার যক্ষপুরীর সংকীর্ণ, বিকৃত জীবন হইতে মুক্তি—এই দুইটি কি একই ঘটনা, বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে? নন্দিনীর প্রেমে রাজাই কি আবার পূর্বের রঞ্জন হইয়া উঠিবে? তাই কি নন্দিনী রঞ্জনের সহিত মিলনের কথা বলে এবং সেই সঙ্গে বলে রাজার মুক্তির কথা?

রাজারও নন্দিনী ও রঞ্জনের মিলন দেখিতে সাধ গিয়াছে।

রাজা। তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

রাজা। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে।

রাজা। আমি জানতে চাই।

নন্দিনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

রাজা। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার পরে তোমার দরদ নেই।

রাজা। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি।

এই ঠকিবার ভয়ে রাজা জালের আবরণ ঘুচাইতে চাহে না। অথচ নন্দিনী রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে বলিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করে, রঞ্জনকে একেবারে অবলুপ্ত করিয়া দিবে বলিয়া নন্দিনীকে ভয় দেখায়। নন্দিনী কিন্তু ভয় পায় না, রাজাকে ধিক্কার দিয়া বলে, "হঠাৎ তোমার একি ভাব। লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে ভালবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে—সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশী হয়। তোমারো-যে সেই দশা।......এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?"

রাজা তখন নন্দিনীকে আপনার শক্তির কথা জানাইতে চায়, বুঝাইতে চায় শক্তির সাধনা করিয়া সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। নন্দিনীর কিন্তু সে শক্তিকে নিষ্ঠুরতার নামান্তর বলিয়াই বোধ হয়।

রাজা বলে সে বড়ো শ্রান্ত, নন্দিনী তখন রাজাকে গান শুনাইতে চায়। কিন্তু গান রাজা মোটেই সহ্য করিতে পারে না, জানালা হইতে সরিয়া যায়। তখন বিশুকে নন্দিনী গান গাহিতে বলে, পথ-চাওয়ার গান। বিশুকে লইয়া সে পথের ধারে অপেক্ষা করিতে যায়, যে পথ দিয়া রঞ্জন আসিবে।

এখন, রঞ্জনের জন্য নন্দিনীর পথের ধারে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার অর্থ কি? রঞ্জন কি একজন বাহিরের ব্যক্তি হিসাবে পথ দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া যক্ষপুরীর সমাজ-ব্যবস্থার ও জীবন-প্রণালীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নায়করূপে আসিয়া উপস্থিত হইবে? তাহা হইলে রাজা ও রঞ্জন কি দুই পৃথক্ ব্যক্তি? কিন্তু নন্দিনী রঞ্জন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলে, তাহাতে তো বুঝি যে নন্দিনীর প্রেমানুভূতিতেই রঞ্জনের অধিষ্ঠান। অধ্যাপক যখন নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে রঞ্জনের আগমনের সংবাদ সর্দারের চোখ এড়াইয়া কোন্ পথ দিয়া আসিল, তাহাতে নন্দিনী বলিয়াছিল, যে-পথে বসন্ত আসিবার খবর আসে সেই পথ দিয়া—তাহাতে লাগিয়া আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা। আকাশের রঙ্ আর বাতাসের লীলায় কেমন করিয়া খবর আসিতে পারে, বস্তুতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক তাহা বুঝিতে পারে নাই, কথাটি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু নন্দিনী বোধ হয় বলিতে চাহিয়াছিল যে আমার প্রেমানুভূতিতেই আমি রঞ্জনকে তোমাদের মাঝখানে আনিয়া দিব। যেদিন আমরা প্রিয়ের সহিত মিলিত হই, সেদিন আকাশে রঙ দেখি, বাতাসে লীলা অনুভব করি। নন্দিনী কথাটিকে

ঘুরাইয়া বলিয়াছে। নন্দিনী বলিতে চাহিয়াছে, যেদিন আকাশে রঙ দেখি, বাতাসে লীলা অনুভব করি, সেদিন বুঝিতে পারি যে প্রিয়ের সহিত মিলন হইবে। এই প্রিয় কোথায় আছে, সে কথা নন্দিনী স্পষ্ট করিয়া বলে নাই, কিন্তু এই প্রিয়ের সহিত মিলন যে নিশ্চিত তাহা নন্দিনী স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে আপনার প্রেমানুভূতিতে। এই প্রেমানুভূতি রহস্যময়। তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া সব সময় বুঝাইতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা কেমন করিয়া যেন হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে এবং কোথা হইতে যেন একটি শক্তির সঞ্চার করে এবং সেই শক্তিতে একটি বিশ্বাস ও নির্ভরতা আনিয়া দেয়। এই প্রেমে যখন হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তখনই নন্দিনী যক্ষপুরীতে তাঁহার প্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারিবে। নন্দিনীর মন আজ কানায় কানায় রঞ্জনের প্রতি প্রেমে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই নন্দিনী জানে রঞ্জন আজ নিশ্চয় আসিবে। এই জানার কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বিশু যখন বলিল, নিশ্চয় খবর আসিল কোন্ দিক হইতে, তখন তাহার উত্তরে নন্দিনী বলিল,—তবে শোন বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠ পাখী এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটা পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালেই জেগে উঠেই দেখি উত্তরে-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে, এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

সংবাদটি বাস্তবতার দিক দিয়া মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু প্রেমের সংবাদকে এর চেয়ে স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, প্রেমানুভূতির লিপি ডাক-পিওনের হাত দিয়া আসে না, এক রহস্যময় উপায়ে আমরা প্রেমানুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হই।

তারপর বিশুর কথার উত্তরে নন্দিনী বলে, রঞ্জনের জয়যাত্রা তাহার হৃদয়ের মধ্য দিয়া। অর্থাৎ রঞ্জনের আবির্ভাব নন্দিনীর প্রেমানুভূতির মধ্য দিয়া। ইহাই যদি রঞ্জনের আসিবার পথ হয়, তাহা হইলে রঞ্জনের জন্য নন্দিনীর পথের ধারে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার অর্থ কি? এই পথ কি নন্দিনীর মনোজীবনের পথ, তথা প্রেমজীবনের পথ? এই প্রেমজীবনের পথেই রঞ্জনের আবির্ভাব হইবে? এই রঞ্জন আসিবে কোথা হইতে? জালের বাঁধা সরাইয়া রাজাই কি নন্দিনীর প্রেমজীবনের ভূমিকায় রঞ্জনরূপে

আত্মপ্রকাশ করিবে? জালের দরজায় ঘা দেওয়া এবং রঞ্জনের জন্য পথে অপেক্ষা করা এই দুইটি বিষয় কি একই? একটিতে আহ্বান, আর একটিতে অপেক্ষা? একটিতে প্রতিবাদ, আর একটিতে আত্মসমর্পণ? একই প্রেমমানসের ইহা কি দুইটি অধ্যায়, দুইটি বিভিন্ন মানসিক ঘটনা?

অথচ সর্দার ও মোড়ল এবং সর্দার ও ছোট সর্দারের কথোপকথনে রঞ্জনকে একটি বাহিরের ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ সর্দার যখন বলে, "ওকি, ওই-না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।" অথবা, ছোট সর্দার বলে, "ওকে দেখে তাঁর (মেজো সর্দারের) এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।" তখন রঞ্জনকে বাহিরের একটি পৃথক ব্যক্তিসত্তা বলিয়াই বোধ হয়।

রঞ্জন যেখানে নন্দিনীর প্রেমিক, রঞ্জন সেখানে একটি ব্যক্তিসত্তা। নন্দিনী মানবী কন্যা; মানবের প্রতিই তাহার প্রেম, ব্যক্তিরূপহীন কোন একটি ideaর প্রতি নহে। কিন্তু যক্ষপুরীতে রঞ্জন ব্যক্তি হিসাবে বাহিরে এখনও পরিদৃশ্যমান নহে। রঞ্জন যে সহজ নবীন প্রাণটিকে প্রকাশ করে নন্দিনী তাহারই বাণী যক্ষপুরীতে আনিয়া দিতে চাহিতেছে। যক্ষপুরীতে রঞ্জনকে এখনও বাহিরের ব্যক্তি হিসাবে দেখা যাইতেছে না (যেমন খোদাইকর, অধ্যাপক প্রভৃতিকে দেখিতেছি) কিন্তু রঞ্জনের জীবন-বাণী নন্দিনীর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে রঞ্জন না থাকিলেও রঞ্জনের প্রভাবটি যক্ষপুরীর সমাজ-জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রভাবটি জানাইবার জন্যই নাটকের প্রয়োজনে রঞ্জনের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহার ক্রিয়াকলাপেরও একটি আভাস দেওয়া হইয়াছে। রঞ্জনের জীবন-বাণী যক্ষপুরীর অধিবাসীরা ক্রমশঃ গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের নায়ক কে? ইহাদের নায়ক (আলোচ্য নাটকে) ফাগুলাল, বিশু প্রভৃতি। রঞ্জনের জীবন-বাণী নন্দিনীর মধ্য দিয়া যে তত্ত্বরূপ লাভ করিতেছে, বিশু, কিশোর, ফাগুলাল প্রভৃতি, খোদাইকরদের মধ্য দিয়া তাহা একটি কর্মরূপ লাভ করিয়া যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। নাটকে এই বিষয়টিকে উপস্থিত করিবার জন্যই রঞ্জনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা রঞ্জন ওখানে ব্যক্তি হিসাবে নাই। বস্তুতঃ, রঞ্জনের ক্রিয়াকলাপগুলিও রহস্যময়।

সর্দার বলিল—তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবের গড়ে এল কী করে।

মোড়ল বলিল—কী জানি, প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার যখন বলিল, ওই তো রঞ্জন গান গাহিয়া চলিয়াছে, উত্তরে মোড়ল বলিল, তাইতো। কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেল্‌কি জানে।

এইরূপে মনে হয়, যক্ষপুরীর অধিবাসীদের উপর রঞ্জনের (রঞ্জন-বাণীর বলাই ভাল) প্রভাবটি বুঝাইবার জন্যই নাটকের প্রয়োজনে রঞ্জনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, নতুবা রঞ্জনের বাহিরে কোন অস্তিত্ব নাই।

*　　　　　*

এদিকে জালের জানালার ভিতরে ভীষণ শব্দ শুনা যাইতেছে। মনে হইতেছে রাজা যেন নিজের উপরে নিজে রাগিয়া গিয়াছে, তাই নিজের তৈয়ারী একটা কিছু চুরমার করিয়া দিতেছে।

ইতিমধ্যে নন্দিনী যক্ষপুরীর বিকৃতির চরম রূপটি দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল, যেন প্রেতপুরীর দরজা খুলিয়া গিয়াছে। সবিস্ময়ে দেখিল অদ্ভুত চেহারার সব লোক রাজ-মহলের খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে তাহার গ্রামের পূর্বপরিচিত লোকগুলিও আছে। অনুপ আছে, উপমন্যু আছে, শকুলু আছে কঙ্কও রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এ কী বেশে সে দেখিল! যক্ষপুরীর নিষ্পেষণে তাহাদের মধ্যে মানুষের যে কিছুই বাকী নাই। কঙ্কুর মতন ছেলেকেও কে যেন আখের মতন চিবাইয়া ফেলিয়াছে। তার সেই ভীরু চোখের লাজুক চাহনি কোথায় গেল! তাহাদের গ্রামের সব আলো নিভিয়া গেল, লোহাটা ক্ষয়িয়া গিয়া শুধু মরচেটাই বাকী রহিয়াছে!

অধ্যাপক নন্দিনীকে বুঝাইবার চেষ্টা করে। বলে, শক্তি সঞ্চয় করিতে গেলে খানিকটা খরচও করিতে হয়, আগুন পাইতে গেলে খানিকটা ছাই আপনি জমা হইয়া যায়।

বড়ো হইবার জন্য এই রাক্ষস-তত্ত্বেক নন্দিনী মানিতে চায় না, বিদ্রোহ করিতে চায়। এতক্ষণ পর্যন্ত নন্দিনীর বিরোধকে দেখিতে পাই রাজার সহিত তাহার প্রেমজীবনের দ্বন্দ্ব লইয়া। এখন যক্ষপুরীর এই বিকৃত মানুষদের দেখিয়া নন্দিনীর এই বিরোধ আরও একটি বিস্তৃত ভূমি আশ্রয় করিল। নন্দিনী বলিল, এই যদি মানুষ হওয়ার রাস্তা হয় তবে চাইনে আমি হওয়া—আমি ওই ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

এই সময় আবার পরাজিত গজ্জু পালোয়ানের সঙ্গে নন্দিনীর দেখা হইল। রাজার সহিত স্পর্ধা করিয়া লড়িতে গেলে অতি শক্তিমানেরও কী অবস্থা হয় নন্দিনী তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইল। গজ্জু বলিল, বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।

নন্দিনী তারপর সর্দারকে বিশু পাগলের কথা জিজ্ঞাসা করে। বিশুকে পাওয়া যাইতেছে না। সর্দার অস্পষ্ট জবাব দেয়। গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করে, গোঁসাই বলিতে চায় না। নন্দিনী আর সহ্য করিতে পারে না, গোঁসাইয়ের জপমালা টানিয়া ছিঁড়িয়া দেয়। নামাবলি কাড়িয়া লইতে চায়। সর্দার বলে, বিশুর বিচারশালায় ডাক পড়িয়াছে। ইহার বেশী বলিবার নাই।

নন্দিনী বলিল, আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎ-শিখার হাতে দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার। তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী। আমি!

সর্দার। হাঁ তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরী নেই।

নন্দিনী। তাই হোক, কিন্তু একটি কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি।

সর্দার। কিছুতে না।

নন্দিনী। কিছুতে না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম।

ইহার পর বিশুকে বন্দী করিয়া প্রহরীরা প্রবেশ করিল। নন্দিনীর প্রশ্নের উত্তরে বিশু বলিল যে, এতদিন পরে সে সত্যকথা বলিয়াছিল বলিয়া প্রহরীরা তাহাকে বন্দী করিয়াছে। সত্যের মধ্যে সে যে মুক্তি পাইয়াছে, এই বন্ধন তাহারই সত্য সাক্ষী হইয়া রহিল।

কিশোর কাজ কামাই করিয়াছে বলিয়া তাহার পিছনে ডালকুত্তা লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিশোর চাহিল বিশুর বদলে নিজে বন্দী হইতে। কিন্তু বিশু রাজী হইল না। বিশু জানাইল, কিশোরের একটি শক্ত কাজ করিবার আছে, তাহা হইল রঞ্জনকে খুঁজিয়া বাহির করা। নন্দিনীর সংবাদ রঞ্জনকে দিবে বলিয়া নন্দিনীর নিকট হইতে রক্তকরবীর গুচ্ছ লইয়া কিশোর প্রস্থান করিল। প্রহরীরা বিশুকে লইয়া গেল বন্দীশালার দিকে। বিশু আপনার দৃষ্টান্ত দিয়া নন্দিনীকে সংগ্রামের কঠোর রূপটি দেখাইয়া দিল, নন্দিনীকে সংগ্রামের জন্য অনেকখানি প্রস্তুত করিয়া দিয়া গেল।

এদিকে বিশুকে বন্দী করিয়াছে শুনিয়া ফাগুলালের দল ক্ষেপিয়া গেল। চন্দ্রা তো নন্দিনীকেই দায়ী করিয়া বসিল। গোকুল আসিয়া চাহিল সবার আগে এই ডাইনীকে পোড়াইয়া মারিতে। ফাগুলাল সকলকে নিরস্ত করিয়া বন্দীশালা ভাঙ্গিবার আয়োজন করিতে চলিল।

কিশোর চলিয়া গিয়াছে মরণের পথে দুঃসাহসিক অভিযানে, বিশু হইয়াছে বন্দী,—নন্দিনীর জীবনে আর শান্তি নাই। সিঁদুরে মেঘে গোধূলির আকাশ আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ওই বুঝি মিলনের রঙ্। নন্দিনীর সিঁথীর সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া গিয়াছে!

* *

ধ্বজা-পূজার আয়োজনে দলে দলে লোক চলিয়াছে। নন্দিনী সকলকে রঞ্জনের খবর জিজ্ঞাসা করে, কেহই ঠিক খবরটি বলিতে পারে না। তখন নন্দিনী জালের দরজার কাছে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে: রঞ্জনকে তাহার চাই-ই চাই।

রাজা বলে, আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী বলে, বুকের উপর দিয়া চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নন্দিনীর স্পর্ধা রাজার অসহ্য হয়, রাজা দ্বার উদ্ঘাটন করে।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে নন্দিনী দেখিল তাহার রঞ্জন পড়িয়া আছে। রঞ্জনকে ডাকিলে রঞ্জন আর জাগে না। রাজা বুঝিতে পারে, তাহার মধ্যে যে-রঞ্জন ছিল সেই রঞ্জনকে সে হত্যা করিয়াছে। রাজা বলিল, আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী। ওকি আমার নাম বলেনি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

রঞ্জনের মৃত্যু-ঘটনার দুইটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। একটি হইল, রাজা বহুদিন ধরিয়া রঞ্জনকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে, আর একটি হইল, সম্প্রতি রঞ্জনকে রাজা হত্যা করিয়াছে। দুইটি বিভিন্ন চিত্র হইলেও, বিষয়টি একই। রঞ্জনের মৃত্যু রাজার জীবনের একটি মানসিক ঘটনা। এই মানসিক ঘটনা বহুদিন হইতে ঘটিতেছে। এখানে সেই মানসিক ঘটনার একটি নাটকীয় রূপও দেওয়া হইয়াছে।

নন্দিনী কিন্তু রঞ্জনকে অভিনন্দন জানায়। বলে, তোমার জয়যাত্রা আজ হতে সুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।

রঞ্জনের তথাকথিত মৃত্যুই কি রাজার আত্ম-বিকাশের অপর নাম?

নন্দিনীর প্রেম-শক্তিতে রাজার জালের আবরণ ঘুচিয়া গিয়াছে, রঞ্জন আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, যদিও সে-রঞ্জন আজ মৃত। পূর্বেই বলিয়াছি, রঞ্জনের এই মৃত্যু একটি বাস্তব ঘটনা হইলেও ভাবের বিচারে ইহা রাজার মনোজীবনের একটি ঘটনা। এই মানসিক ঘটনা বাহিরের বাস্তব ঘটনাকে প্রভাবিত করিতেছে, তাই আমরা রঞ্জনকে ব্যক্তিরূপে দেখিতে পাইতেছি না।

রাজার সহিত সংগ্রামে কিশোরও ধ্বংস হইয়াছে। কিশোরের প্রাণদানটি কিন্তু কোন একটি মানসিক ঘটনা নহে, ইহা একটি বাস্তব ঘটনা। কিশোর কেমন করিয়া প্রাণ দিল, তাহার সংগ্রামের রূপটি কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। নন্দিনীর উত্তরে রাজা শুধু বলিল, বুদবুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

তখন নন্দিনী বলিল, রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে, আজ আমাকে তোমার সাথি করো, নন্দিন।

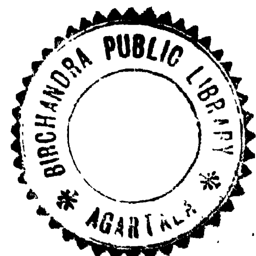
নন্দিনী। কোথায় যাব।

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই সুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।

ইতিমধ্যে ফাগুলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজাকে ও নন্দিনীকে একসঙ্গে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। পরে রাজার কথা শুনিয়া সে আশ্বস্ত হয়। নন্দিনী বলে, রঞ্জন তোমাদের সকলের মধ্যে আসিয়াছে। রাজা বলে, ফাগুলালের দলবলকে লইয়া একসঙ্গে সর্দারের বিরুদ্ধে, তথা যক্ষপুরীর বিধানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাইতে হইবে। পথ দুর্গম, সঙ্কুল, তথাপি সংগ্রামই এখন একমাত্র পথ। রঞ্জনের জয়ধ্বনি করিয়া নন্দিনী অগ্রসর হয়, রাজা নন্দিনীকে অনুসরণ করে।

সকল সংবাদ শুনিয়া পুঁথিপত্র ফেলিয়া অধ্যাপক আসিয়া উপস্থিত। চরম প্রাণের সন্ধানে নন্দিনীকে অনুসরণ করিতে আর দ্বিধা করিল না সে।

সবশেষে ভাঙ্গা বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইয়া বিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। সংগ্রামে যাইবার বেগে নন্দিনীর হাত হইতে রক্তকরবীর কঙ্কণ ধূলায় পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাই বিশু সযত্নে তুলিয়া লইল নন্দিনীর শেষ দান বলিয়া।



পঞ্চম অধ্যায়

প্রকাশ-ভঙ্গী

পূর্ব-অধ্যায়ে নাট্য-কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম তাহাতে একটি বিষয় পরিস্ফুট হইবে যে, নাট্যবস্তু মানবজীবনেরই সুখ-দুঃখের কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলা হইয়াছে তাহাও একান্ত ভাবে মনোধর্মী মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব। নাট্যবস্তুর অধিকাংশই অন্তর্নাট্য বা inner dramaর উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের যে প্রকাশগুলির নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই মনোজীবনের ঘটনা। সেই মানসিক ঘটনাগুলিকে নাট্যরূপ দিতে গিয়া নাটকটির শিল্পরূপে কতকগুলি বিশিষ্ট ভঙ্গী আসিয়া গিয়াছে। নাটকের মধ্যে বাস্তব জীবনের ঘটনাও রহিয়াছে। মনোজীবনের ঘটনাগুলির সহিত বাস্তবজীবনের ঘটনাগুলি পাশাপাশি চলিয়াছে এবং উভয়ে মিলিয়া নাট্যবস্তুর একটি সামগ্রিকরূপ প্রকাশ করিতেছে। বাস্তব ঘটনা ও মানসিক ঘটনা, এই দুই পর্যায়ের ঘটনা পৃথক করিয়া চিনিতে না পারিলে এবং তাহাদের সমন্বয়ের রূপটি বুঝিতে না পারিলে নাটকটিকে বুঝা যাইবে না। বাস্তব ঘটনাগুলির রূপায়ণ সহজ ও সাধারণ, সেগুলিকে আমরা তাই সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু মানসিক ঘটনাগুলি—যে ঘটনাগুলির কোন বাস্তব বাহ্যিক রূপ নাই, সেগুলিকে একটু মনোযোগ দিয়া অনুসরণ করিতে হয়। সেগুলির রূপায়ণে নাট্যকার বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহারই জন্য সমগ্র নাটকটি গতানুগতিক শিল্প-ভঙ্গী ছাড়িয়া একটি বিশিষ্ট শিল্প-রূপ লাভ করিয়াছে। অতঃপর রূপায়ণের এই বিশিষ্টতার কয়েকটি নিদর্শন দিব, অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরগুলি খুঁজিয়া লইবেন।

প্রথমেই নাট্যরূপের যে বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল রঙ্গমঞ্চের উপর জালের আবরণটি। এই আবরণটি অভিনয়ের একটি প্রধান উপকরণ। এখন এই জালের আবরণটির তাৎপর্য কি এবং নাটকে ইহা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে তাহা বুঝিয়া দেখা যাক্।

নাট্য-কাহিনীর মধ্যে এই জালের পর্দার আভাস বারংবার দেওয়া হইয়াছে। নন্দিনী বলিয়াছে, তোমাদের রাজাকে এই একটি অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। এই

জালটি মানসিক ভাবের নাট্য-রূপ। রাজার যে নৃপতিত্ব মানবসাধারণের সহিত তাহার আত্মার একটা ব্যবধান রচিয়া দেয়, যাহার জন্য রাজা সহজ প্রাণের সম্বন্ধে সকলের সহিত মিলিতে পারে না, সেই নৃপতিত্বের ব্যবধানটিকে বুঝাইবার জন্য নাটকের প্রয়োজনে একটা জালের পর্দার অবতারণা করা হইয়াছে। নন্দিনীর সহিত রাজার মিলনের বাধাও ইহাই। রাজার দিক হইতে এই ব্যবধান ও বাধা খানিকটা মানসিক এবং খানিকটা বাহ্যিক—বাহ্যিক এই অর্থে যে, নৃপতিত্বের রূপটি শুধু রাজার অন্তরের নয়, সমাজ-জীবনগত তাহার একটি বাহ্যিক রূপ আছে, নন্দিনীর দিক হইতেও অনুরূপভাবে এই বাধা খানিকটা মানসিক এবং খানিকটা বাহ্যিক। অন্তরে বা বাহিরে এই ব্যবধানের রূপটি যেমনই হউক না কেন, ইহার একটি প্রকৃতি হইল ইহার জটিলতা। অদ্ভুত জালের পর্দার দ্বারা এই জটিল বাধাকে জানানো হইয়াছে। এই ব্যবধানটি নাটকীয় দ্বন্দ্বের মূল বিষয় বলিয়া এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহা নাট্য-কাহিনীকে অধিকার করিয়া আছে বলিয়া ইহাকে জালের আবরণের আকারে একটি স্থায়ী উপস্থিতি দিতে হইয়াছে। ইহারই সাহায্যে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বটি এবং যক্ষপুরীর সহিত রাজার সম্বন্ধটি অতি সহজে ব্যক্ত করা হইয়াছে। রাজা শক্তির সাধনা করে এবং শক্তির অধিকারী হইয়া আপনার নৃপতিত্বকে বজায় রাখিতে চায়। জীবনের সহজ স্বাভাবিক পরিচয়কে আড়াল করিয়া রাজার এই নৃপতিত্বই শুধুমাত্র প্রকাশ পাইতেছে। এই নৃপতিত্বকে আঘাত করিয়া, উপেক্ষা করিয়া নন্দিনী রাজার মধ্যে মানুষটিকে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। রাজা এই নৃপতিত্বকে বর্জন করিতে চায় না যদিও এই নৃপতিসত্তার অন্তরালে রাজার মধ্যে একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই বিষয়টি মূলতঃ রাজার মনোজীবনের বিষয় হইলেও এই নৃপতিত্বের একটা বাহ্যিক রূপ-প্রকাশও আছে। এই বাহ্যিক এবং মানসিক উভয় রূপকেই জালের আবরণের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। যক্ষপুরীর অধিবাসীরা রাজার নৃপতিত্বকে বাহিরের দিক হইতে দেখিতেছে। এই জালটির অর্থ তাই তাহারা জানে। সকলেই জানে রাজার সহিত সহজে দেখা করা যায় না। যতটুকু দেখা হয় ততটুকুতে মানুষটার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাণবাগীশ ও অধ্যাপকের কথোপকথনটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।—

পুরাণবাগীশ। এখন বলো তো, তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়।

অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ওই জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে। এই জালের আড়াল থেকে?

অধ্যাপক। তা নয় তো কি। ঘোমটার আড়াল থেকে যে রকম রসালাপ হতে পারে সে ধরণের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গরু বোধ হয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

এই ভাবে দেখি জালের আবরণটি নাট্যবস্তুর রূপায়ণে কিরূপ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। রাজার মনোজীবনে যে দুইটি সত্তার দ্বন্দ্ব, নৃপতিসত্তা ও মানবসত্তা, তাহাকেই নাট্যরূপ দিতে গিয়া নাট্যকার জালের পর্দার অবতারণায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। নৃপতিসত্তাকে ধ্বংস করিয়া মানবসত্তার মুক্তি হইল, রাজার মনোজীবনের এই ঘটনাটি জালের দরজা উদ্ঘাটন করিয়া যকর-রাজের বাহিরে আসার মধ্যে একটি সুন্দর নাটকীয় রূপ লাভ করিয়াছে।

এই রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বও কতকগুলি মানসিক ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছে। মনোজীবনের সেই ঘটনাগুলিকে নাট্যকার নিপুণতার সহিত নাট্যরূপ দিয়াছেন। রাজার মধ্যে দুই সত্তার দ্বন্দ্ব চলিতেছে; দ্বন্দ্বের রূপটি উপস্থিত করিতে নাট্যকার কতকগুলি মানসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

নন্দিনী একস্থানে বলিয়াছে,—"আমার রঞ্জনের জোর শঙ্খিনী নদীর মতো, ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে।" রাজার মধ্যে এই রঞ্জনই তো দ্বন্দ্ব জাগাইয়াছে। রঞ্জনের শক্তির উল্লেখে তাই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতির একটা পরিচয় পাই। বুঝিতে পারি এমন একটি ভাঙনের সম্ভাবনা তাহার মধ্যে আছে। ইহার পর নন্দিনীর সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া দ্বন্দ্বের স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বন্দ্বের ফলটি অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের কথোপকথনের মধ্য দিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে।

পুরাণবাগীশ। ভিতরে একি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো! ভয়ঙ্কর শব্দ যে!

অধ্যাপক। রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ। মনে হচ্ছে বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল তাতে এসে জমা হত। একদিন তার বাঁদিকের পাথরের

স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

এখানেও শঙ্খিনী নদীর উপমায় বুঝিতে পারি যে, নন্দিনী রঞ্জনের যে শক্তির কথা বলিয়াছিল তাহারই ক্রিয়া রাজার মধ্যে সুরু হইয়াছে। এই ক্রিয়াটি মানসিক। কতকগুলি মানসিক ঘটনার মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ। জালের ভিতরে বিভিন্ন আন্দোলনের আভাসে রাজার অন্তরের সেই মানসিক ঘটনাগুলির কথাই বলা হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা রাজার জীবনের একটি বিকাশ দেখানো হইয়াছে।

এইরূপে ঘটনার সূচনা ও পরিণতি অনেকক্ষেত্রে শুধুমাত্র উল্লেখের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। বাস্তব কোন ঘটনার সৃষ্টি করা হয় নাই। কারণ, তাহা বাস্তব কোন ঘটনায় প্রকাশিতব্য নয়, তাহা একান্তভাবে মানসিক ঘটনা। একস্থানে সর্দারের প্রসঙ্গে নন্দিনী বলিতেছে, "ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।" পরে ছোট সর্দারের মুখে শুনিতে পাই, "ওকে (রঞ্জনকে) দেখে তাঁর (মেজো-সর্দারের) এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি সে ওর হাসি দেখলেই বুঝতে পারি।"

এখানে বাস্তব ঘটনার সৃষ্টি না হইলেও একটি বিষয়ের সূচনা ও তাহার পরিণতি উভয়ই বুঝিতে পারি। এখানে মেজো সর্দারের মধ্যেও একটি inner dramaর কথা বলা হইয়াছে। এখানে মেজোসর্দারের চরিত্রের এই পরিণতির অন্তরালে যে inner drama অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, আমাদিগকে সেই inner dramaটিকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

কিশোরের প্রাণদানের ব্যাপারটির মধ্যে চমৎকার একটি রসব্যঞ্জনা ফুটিয়াছে। কিশোরের সহিত রাজার সংঘর্ষটি কিছুটা রাজার মনোজীবনের ঘটনা এবং কিছুটা রাজার বাস্তব-জীবনের ঘটনা। মনোজীবনের ঘটনা ততটুকু, যতটুকুতে রাজার মনোজীবনের সংঘাত, যতটুকুতে তাহার নৃপতিসত্তার সহিত তাহার মানবসত্তার বিরোধ, যে মানবসত্তা কিশোরের মত প্রাণোদ্দীপ্ত বালককে দেখিয়া স্বধর্ম অনুভব করে এবং আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। আর ইহার

মধ্যে বাস্তব-জীবনের ঘটনা ততটুকু, যতটুকুতে কিশোরের প্রাণের বিনাশ। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে কিশোরের প্রাণদান কোন একটি বিশেষ মানসিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহা কিশোরের জীবনের অতি রূঢ় বাস্তব ঘটনা। কিন্তু রাজার নৃপতি-সত্তার সহিত সংঘর্ষে এই প্রাণদানটি কিরূপ বাস্তব ঘটনার সৃষ্টি করিবে তাহা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া নাট্যকার একটি রসব্যঞ্জনার অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধারণ নাটকীয় চরিত্রের পরিণতির পক্ষে ইহা একটি ত্রুটির বিষয় বলিয়া মনে হইলেও নাট্যবস্তুর বিশিষ্টতায় রসের হানি হয় নাই।

নাটকের মধ্যে রাজা ও নন্দিনীর এবং অনেকস্থলে অন্যান্য পাত্র পাত্রীরও কথাবার্তাগুলি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় ও গূঢ়ার্থপূর্ণ। এই ব্যঞ্জনাগুলি ধরিতে পারিলে বাস্তব ঘটনার স্বল্পতা সত্বেও বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্বগুলির বিকাশ বুঝিতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য কথাগুলির অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যদি বাস্তব ঘটনার জন্যই কেবলমাত্র উৎসুক হইয়া উঠি তাহা হইলে নাটকটিকে যথাযথ অনুসরণ করা যাইবে না। রক্তকরবী নাটকের নাট্য-ভঙ্গীর বিশিষ্টতা নিরূপণে সংলাপ-বৈচিত্র্যকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

জালের জানালার মধ্য দিয়া রাজার যে মাঝে মাঝে একখানি হাত বাহির হইয়া আসে, ইহার দ্বারা সুকৌশলে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের মানসিক ঘটনাগুলিকে কিছু কিছু প্রকাশ করা হইয়াছে।

নন্দিনী কর্তৃক যক্ষপুরীর অধিবাসীদের ক্লিষ্ট, ক্লান্ত রূপদর্শন এবং নন্দিনীর তৎকালীন দীর্ঘ বিবৃতি নাটকটির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের যে দুর্দশা খণ্ড খণ্ড বহু বাস্তব ঘটনার সৃষ্টি করিয়া দেখানো যাইত, তাহাই একটি বিবৃতির মধ্য দিয়া জানানো হইয়াছে। সাধারণ নাটকের বিচারে অভিনয়কালে এরূপ দীর্ঘ বিবৃতি নাটকীয় গুণ বর্জিত। কিন্তু এখানে বাস্তব ঘটনাগুলি সৃষ্টি করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়, নন্দিনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগাইয়া তোলাই উদ্দেশ্য। নন্দিনীর মুখের বিবৃতি হইতেই দর্শকরা যাহাতে নন্দিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

অনেক স্থলে কতকগুলি মানসিক ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর জীবন-দ্বন্দ্বটি বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়া শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে। জালের পর্দার আড়ালে রাজার ক্রিয়াকলাপগুলি মানসিক ঘটনার আভাস দেয়; জাল ছিঁড়িয়া রাজার বাহির হইয়া আসাও একটি মানসিক ঘটনাকেই প্রকাশ করে, কিন্তু

ইহার পর রাজা যখন রঙ্গমঞ্চে স্বহস্তে ধ্বজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তখন তাহাতে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি বাহ্যিক বাস্তব ঘটনারই সৃষ্টি করিয়াছে।

নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত আরও বহু বাস্তব ঘটনা রহিয়াছে। মানসিক ঘটনাগুলির সহিত একত্র করিয়া সেগুলিকে বুনিয়া নাট্যবস্তুর একটি সামগ্রিক রূপ উপস্থিত করা হইয়াছে।

নাট্য-কাহিনীর রূপায়ণ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহাতে নাট্যরূপের বিশিষ্টতা কিছুটা বুঝিতে পারা যাইবে। রূপায়ণের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিতে না পারিলে নাটকটি দেখিয়া রস পাওয়া যাইবে না। ইহাকে সাধারণ নাটকের পর্যায়ে গণ্য করিয়া দেখিলে যেখানে হয়তো খুব বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের প্রত্যাশা করিব, সেখানে সামান্য কয়েকটি ব্যঞ্জনাময় সংলাপে মন তৃপ্ত হইবে না। নাটকটিকে কেমন যেন প্রাণহীন, নাটকীয়তা বর্জিত বলিয়া মনে হইবে, Dramatic moment বা নাটকীয় মুহূর্তগুলি ধরিতে পারিব না। এই শ্রেণীর নাটক দেখিতে তাই উপযুক্ত রসদৃষ্টির প্রয়োজন। গতানুগতিক নাটকের যাহা দেয়, ইহাতে তাহা নাই এবং সে আশা লইয়া গেলে অভুক্ত ফিরিতে হইবে। এই শ্রেণীর নাটক আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা এই জন্যই। জনসাধারণের রসদৃষ্টি আরও গভীর ও ব্যাপক না হইলে এই শ্রেণীর নাটকের যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। তাহার জন্য নাটকগুলিকে হয়তো শতাব্দীকাল, কি তাহারও অধিক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

'রক্তকরবী' নাটকের শিল্প-ভঙ্গী ও তাহার বিশিষ্টতার যে পরিচয় দিলাম, তাহার সহিত হয়তো অনেকের মতবিরোধ থাকিতে পারে। এখানে কোন অলঙ্কারশাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমার যুক্তিকে সমর্থন করিতে পারিব না, কারণ গতানুগতিক নাট্যশাস্ত্রের সূত্রানুযায়ী শিল্প-ভঙ্গীর বিশ্লেষণ করি নাই। এই নাটকে মানবজীবনের সুখদুঃখের কাহিনীটিকে যতদূর বুঝিতে পারা যায় এবং যে ভাবে বুঝিতে পারা যায়, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। রক্তকরবী নাটককে ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে হয়তো বিশ্লেষণের যুক্তিগুলি অর্থহীন ও নগণ্য হইয়া পড়িবে। সে ক্ষেত্রে তর্কেরও কোন অবকাশ থাকে না, কারণ, মূলে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিলে বৃথা চীৎকার করা ছাড়া কোন একটা সমাধানে আসিবার সহজ পথ নাই। সে ক্ষেত্রে আমার সকল যুক্তি বানচাল হইয়া গেলেও সাহিত্য-আসরের হট্টগোল হইতে আপাততঃ বিরত রহিলাম।

কিন্তু পরিশেষে আর একটি প্রশ্নের আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গটি শেষ করিতে চাই। প্রশ্নটি হইল এই যে, রক্তকরবী নাটককে ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী বলিয়া ধরিলেও অনেক স্থলে শ্রেণীগত জীবন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে নাটকের মধ্যে প্রতীকত্বকে প্রাধান্য দিয়াছে। সেস্থলে নাটকটির জাতি নির্ণয়ে উপায় কি এবং কোন্‌দিক হইতেই বা নাটকটিকে বুঝিতে হইবে।

কথাটি সত্য। শ্রেণীগত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রক্তকরবী নাটকের বিষয়বস্তুকে আমরা প্রতীকার্থে দেখিয়া তাহার একটি বিস্তৃততর ক্ষেত্র রচনা করিয়া লই। ইহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হয় এবং তাহাতে আমাদের এক প্রকার রসাস্বাদনও ঘটে। বস্তুতঃ যক্ষপুরী স্থানটিকে আমরা বিশেষ কোন ভৌগোলিক স্থান হিসাবে গ্রহণ না করিয়া তাহাকে প্রতীকার্থেই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং আধুনিক সভ্যতার সহিত মিলাইয়া প্রতীকার্থটি যত উপলব্ধি করি ততই একপ্রকার রস পাইয়া থাকি। যক্ষপুরীর রাজা, সর্দার, মোড়ল, অধ্যাপক, খোদাইকরগণ প্রভৃতি চরিত্রগুলিকেও শ্রেণীগত জীবনের দিক হইতে দেখিলে রসানুভূতির ক্ষেত্র বাড়িয়া যায়। ইহাদের মধ্য দিয়া শ্রেণীগত জীবনও প্রকাশ পাইতেছে, সে কথা সত্য, কিন্তু ইহাকেই একান্ত করিয়া দেখিলে ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব-রূপটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তখন বিশুর প্রেম, নন্দিনীর বেদনা, রাজার গভীর দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, কিশোরের প্রাণদান প্রভৃতি বিষয়গুলি তাহাদের সূক্ষ্ম ও গম্ভীর আবেদন হারাইয়া ফেলে। রক্তকরবী নাটকের ভাববস্তুকেও আমরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পারি না, তাহাকে অযথা সংকীর্ণ করিয়া অথবা অযথা ব্যাপ্ত করিয়া দেখি।

আমাদের জীবনের পরিচয় দুই প্রকারে; একটি পরিচয় ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে,—সেখানে আমাদের বাসনা-কামনা, আমাদের সুখ-দুঃখ লইয়া আমরা বিশিষ্ট। আর একটি পরিচয় শ্রেণীগত মানুষ হিসাবে,—সেখানে আমরা বিশেষ কতকগুলি ধর্মের একটি সমষ্টিগত রূপমাত্র। আমরা সাধারণতঃ এই ব্যক্তি-জীবনই যাপন করি, শ্রেণীগত জীবন আমাদের কাছে গৌণ হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণীগত জীবন প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এখন, ব্যক্তিজীবন ও শ্রেণীজীবনের মধ্যে একটি বিরোধ বা বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ব্যক্তি-জীবনে যে একটি স্বতন্ত্রতা ও বিশিষ্টতা প্রকাশ পায়, শ্রেণীজীবনে, বহুর সহিত মিলিয়া সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে লোপ পায়। শ্রেণীগত জীবন অতিমাত্রায় প্রাধান্য লাভ করিলে ব্যক্তিজীবনের

প্রকাশ অনেকখানি রুদ্ধ হইয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের ব্যক্তি-জীবনের পাশাপাশি একটা শ্রেণীগত জীবন সমান ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। এখন তাই এই শ্রেণীগত জীবনের বোধ আমাদের মনের মধ্যে রসাস্বাদনের ভূমিকা অনেকখানি রচনা করিয়া দেয়। তাহার জন্য আমরা প্রাচীনযুগের সাহিত্য হইতেও ব্যক্তি-জীবনের চিত্রগুলির অন্তরালে শ্রেণীগত জীবনের রূপটিও খুঁজিয়া বাহির করিতে চাই। রসাস্বাদনের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পর্যন্ত এই অনুসন্ধানে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেখানে এই অনুসন্ধানের ফলে ব্যক্তি-জীবনের রসরূপটি আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেখানে বুদ্ধির অভিমান ত্যাগ করিয়া অনুসন্ধিৎসাকে সংযত করিতে হইবে। এই অনুসন্ধিৎসায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকিতে পারে, রসিকতার পরিচয় নাই। কবিগুরু এই সমস্যাটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। রামায়ণ হইতে শ্রেণীগত জীবনের রূপটি অনুসন্ধান করিয়া রক্তকরবী নাটক সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটি জানাইয়াছেন।—"হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটি রূপক কথা। বিশেষতঃ যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা ; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আর একদিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর একদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষ-গত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।...সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা-হলে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা'হলে তার দায় কবির নয়।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

যক্ষপুরী

'রক্তকরবী' নাটকের ভাববস্তু ও শিল্প-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, অতঃপর নাটকে যে বিভিন্ন জীবন-রূপায়ণ দেখি সেগুলির আলোচনায় "রক্তকরবী"র জীবন-তত্ত্বের কথা বলিব। জীবনের এই বিভিন্ন রূপায়ণ বুঝিতে গেলে যে সমাজ-জীবনের পট-ভূমিকায় এই জীবন-চিত্রগুলি আঁকা হইয়াছে সেই সমাজ-জীবনকে সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। 'রক্তকরবী' নাটকে সমাজ-জীবন অনেকখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সেই সমাজ-জীবনটির বিস্তৃত পরিচয় লওয়া তাই প্রয়োজন। ইতিপূর্বে নাটকের ভাব-বস্তু প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বিকৃত-জীবন হইতে সহজ-জীবনের মধ্যে মানব-জীবনের উন্নতির কথাই রক্তকরবী নাটকে বলা হইয়াছে। নাট্যবস্তুতে দেখি একটি বিশেষ সমাজ-জীবন এই বিকৃত জীবনের আধার হইয়া আছে এবং কয়েকটি ব্যক্তি-জীবনের আত্ম-জাগরণের মধ্য দিয়া সহজ-জীবনের কথা বলা হইয়াছে। বিকৃত সমাজ-জীবনের প্রতি-কূলতায় ব্যক্তি-জীবন বিরোধের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। রক্তকরবী নাটকের এই সমাজ-জীবনের চিত্রটিকে ধরিতে না পারিলে ব্যক্তি-জীবনের পরিচয়টি পরিস্ফুট হইবে না। কোন্ দিক হইতে সমাজ-জীবনের স্বরূপটিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, ভাববস্তু-প্রসঙ্গে তাহারও আভাস দিয়াছি। সমাজ-জীবন যেখানে সত্য-লাভের, তথা উত্তম আনন্দ লাভের সহায় হইতেছে না, পরন্তু আপনার বিকৃতি দ্বারা ব্যক্তি-জীবনকে একটি বিকৃতরূপে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই দিক দিয়া এখানে সমাজ-জীবনকে দেখিতে হইবে।

'রক্তকরবী' নাটকে যে সমাজ-জীবনের কথা বলা হইয়াছে, আমরা তাহাকে 'যক্ষপুরীর সমাজ' বলিতে পারি। এই 'যক্ষপুরী' নামটির পরিচয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, ইহার ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই নামকরণের দ্বারা কোন বিশেষ স্থানকে নির্দিষ্ট না করিয়া আধুনিক সভ্যতার সমাজ-জীবনকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নাটকের প্রয়োজনে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান-মহিমা লাভ করিয়াছে। 'যক্ষপুরী' এই নামকরণের দ্বারা একটি সঙ্কেত আত্মপ্রকাশ করিলেও ইহার দ্বারা নাটকের রূপকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ এই সঙ্কেতটি আমাদের জীবন-বোধের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যায় যে ইহাকে আমরা

বাস্তবরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকি। যক্ষপুরী বলিতে আধুনিক সভ্য দেশের নগরগুলিকেই মনে পড়ে এবং এই নগর-সভ্যতা আজ এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে তাহাকে কোন বিশেষ স্থানে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিতে হয় না। এখন এই 'যক্ষপুরী' নামকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "যে জায়গাটার কথা হচ্ছে, সেখানে মাটির নিচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই চলছে। এইজন্যেই লোকে আদর করে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে।" এই স্বর্ণ-আহরণই যক্ষপুরীর সমস্ত বিধি-বিধানের মূল কথা। খোদাইকরেরা এই স্বর্ণ আহরণ করিতেছে, রাজা এই স্বর্ণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, যক্ষপুরীর সমাজ-নীতি ও সমাজ-মনস্তত্ত্বের মূলে রহিয়াছে এই স্বর্ণ-প্রীতি। আধুনিক সভ্যতায় সমাজ-জীবনের বিকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ এই স্বর্ণ-প্রীতির দিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যক্ষপুরীর এই স্বর্ণ-প্রীতিকে প্রথমে বুঝিয়া দেখা যাক।

সহজভাবে বাঁচিয়া থাকার জন্য আমাদের জীবনের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা আমরা অনেকাংশে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়া থাকি। আলো-বাতাস, অন্ন-জল, ফল-মূল প্রভৃতি প্রকৃতির দান। এই দানগুলি পশুও পাইয়া থাকে, মানুষও পাইয়া থাকে। এই দুই পাওয়ার মধ্যে প্রভেদ হইল এই যে, পশু এই দানগুলিকে যে ভাবে গ্রহণ করে, মানুষ সে ভাবে গ্রহণ করে না। অত্যন্ত স্থূল প্রয়োজনের বিষয়গুলিকেও মানুষ আপনার মানব-স্বভাব দ্বারা বিচিত্র উপায়ে গ্রহণ করিয়া থাকে। পশুর মত সে ঝরণার ধারে গিয়া উপুড় হইয়া জল খায় না, জল খাইবার জন্য সে জলপাত্রের ব্যবহার করে। ভোগের বস্তুকে সে নানাভাবে গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। ইহাতে তাহার বুদ্ধি ও বোধ কাজে লাগিয়াছে। এই বুদ্ধি ও বোধের অভাবে প্রকৃতির অনেক দানই পশু গ্রহণ করিতে অক্ষম, কিন্তু মানুষ ইহারই শক্তিতে প্রকৃতির দানগুলিকে বিভিন্ন বিচিত্র উপায়ে গ্রহণ করিয়া জীবনে ভোগের ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃততর করিয়া তুলিয়াছে। এই ভোগের ক্ষেত্র বাড়াইয়া তোলার কাজে নিয়োজিত হইয়াছে মানুষের বিজ্ঞান।

কিন্তু শুধুমাত্র এই বস্তুগত ভোগের বিশিষ্টতাতেই মানুষ পশু হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে নাই, ইহা ছাড়াও আর একদিকে মানুষ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। তাহা হইল মানুষের মধ্যে একটি মানসিক ভোগের দিক। ফুলকে দেখিয়া মানুষের ভালি লাগে, আকাশকে দেখিয়া সে পরিতৃপ্ত হয়, সকলকে ভালবাসিয়া

সে খুশি। এই মানসিক ভোগগুলিতেও মানুষ একটি বিশিষ্টতা লাভ করে। এমন কি, বস্তুগত-ভোগগুলি যতই বিচিত্ররূপ লাভ করুক না কেন তাহার মূলে যেন একটি জৈব প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। কিন্তু এই মানসিক ভোগগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহার মধ্য দিয়া মানুষ যেন পশু জীবন হইতে সম্পূর্ণ এক পৃথক্ ধারায় পথ চলিয়াছে। ইহাতেও মানুষ বিশেষ করিয়া তাহার মানব-সত্তাকে অনুভব করে। মানুষের এই মানসিক ভোগের ক্ষেত্রটিকে বাড়াইয়া তোলার কাজে লাগিয়াছে ধর্ম।

এই বস্তুগত ভোগ ও মানসিক ভোগকে, বিজ্ঞান ও ধর্মকে জীবনে একেবারে পৃথকরূপে নির্দিষ্ট করা যায় না। আমাদের জীবনে এই উভয়ই মিশিয়া আছে, উভয়ের সমন্বয়ে মানুষের মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আমাদের জীবনে এই দুই প্রকার ভোগবৃত্তির মধ্যে একটি বিরোধ দেখা যায়। মানুষের মধ্যে জৈব-প্রেরণা মানুষকে বস্তুগত ভোগের দিকে টানিতেছে আর আধ্যাত্মিক প্রেরণা মানুষকে এই বস্তুগত ভোগের উর্ধ্বে তুলিয়া তাহাকে সূক্ষ্ম মানসিক ভোগে লিপ্ত করিতেছে। এই দুই বৃত্তির সমন্বয় সাধন করিয়া মানুষের মানবিক সত্তা আপন মহিমাকে প্রচার করিতেছে। যে কোন একটি বৃত্তি প্রধান হইয়া উঠিলে মানব-জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। যদি বস্তুগত-ভোগ জীবনে একান্ত হইয়া উঠে তবে মানুষ জীবসীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে, আর যদি বস্তু-জগৎকে অস্বীকার করিয়া শুধুমাত্র মানসিক-ভোগ একান্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলেও জীবন এই বস্তু-জগতের ভূমি-ত্যাগ করিয়া একটি অতিলৌকিক জগৎ আশ্রয় করে। যে-জীবনে এই উভয়েরই একটি সমন্বয় রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই সহজ-জীবনের কথা বলিয়াছেন। জীবনের বস্তুগত ভোগের সহিত মানুষ যখন একটি মানসিক ভোগের অবতারণা করে এবং সেই মানসিক ভোগের সহিত মিলাইয়া বস্তুকে গ্রহণ করিতে চায়, তখন সেই মানসিক ভোগের বৈশিষ্ট্যে মানুষ একটি বৃহত্তর বাস্তব-জীবন রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ যে সহজ-জীবনের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই বৃহত্তর বাস্তব-জীবন।

আধুনিক সভ্যতার যক্ষপুরী আমাদের জীবনের এই মানসিক ভোগের দিকটিকে সংকীর্ণ করিয়া অথবা অস্বীকার করিয়া জীবনের বস্তু-ভোগের ক্ষেত্রটি বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। বস্তু-বিজ্ঞান নিত্য নূতন ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, আমাদের ভোগবৃত্তি সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া

যতই চরিতার্থ হইতেছে, ততই আমরা একপ্রকার মানবিক শক্তি অনুভব করিতেছি। আজ আধুনিক সভ্যতার দিকে চাহিয়া দেখিলে সর্বত্রই এই বস্তু-ভোগের বিস্তৃত ক্ষেত্রটি দৃষ্টিগোচর হয়। এই বহুল উপকরণের মধ্যে পড়িয়া আমাদের জীবন একান্তভাবে ভোগ-বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদা জীবন-রক্ষার জন্য যেটুকু বস্তু-ভোগের প্রয়োজন ছিল, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। ইহাতে আমাদের জীবনের ভারসাম্যটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমরা উপকরণগত, ভোগবৃত্ত জীবনকে প্রধান করিয়া তুলিতে গিয়া জীবনকে যেভাবে রূপায়িত করিতেছি, তাহাতে জীবনের নানা বিকৃতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এই অতিরিক্ত বস্তুগত ভোগ-স্পৃহাকেই রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণ-প্রীতি বলিয়াছেন। এই স্বর্ণ-প্রীতি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। যক্ষপুরীর অধিবাসীরা নিয়ত এই স্বর্ণ আহরণ করিতেছে, যক্ষপুরীর রাজা এই স্বর্ণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। এই স্বর্ণ-প্রীতি যক্ষপুরীতে একটি বিশিষ্ট সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই সমাজ-জীবনের পরিচয়টি গ্রহণ করিবার পূর্বে স্বর্ণ-প্রীতি কথাটিকে অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা যাক।

সমাজ-বন্ধনের পর মানুষ যখন সম্মিলিতভাবে প্রকৃতি-দত্ত ভোগের বিষয়-গুলিকে ভোগ করিতে লাগিল, তখন একের অভাব ও অপরের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগের বিষয়গুলির আদান-প্রদান চলিতে লাগিল। প্রকৃতি-দত্ত ভোগের বিষয়গুলির মূল্য দুই দিক দিয়া বিচার্য। একটি হইল তাহার ব্যব-হারিক মূল্য (Value-in-Use), আর একটি হইল তাহার বিনিময় মূল্য (Exchange Value in)। যে বিষয়টি সর্বত্র সহজে পাওয়া যায় তাহার আর কোন আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয় না। তাহার ব্যবহারিক মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু বিনিময় মূল্য নাই, অর্থাৎ তাহার বিনিময়ে অন্য কোন বস্তু দান করা চলে না; কিন্তু যাহা সর্বত্র সুলভ নহে অথচ যাহার ব্যবহারিক মূল্য আছে, সেগুলিই আদান-প্রদানের বিষয় হইয়া উঠিল। সেগুলির ব্যবহারিক মূল্য ছাড়াও একটি বিনিময়-মূল্য স্বীকৃত হইল। প্রথমে এই সকল বস্তুর বিনিময়ে মানুষ আপনাপন অভাব মিটাইয়া লইত। এই একবস্তুর পরিবর্তে অপর বস্তু গ্রহণের প্রথাকে বিনিময় প্রথা বা Barter system বলা হইত। কিন্তু পরে এই প্রথার কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য সমাজে মুদ্রানীতির প্রচলন আরম্ভ হইল। ইহাতে দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কয়েকটি বস্তুর ব্যবহার সুরু

হইল। কয়েকটি বিশেষ ধর্ম অনুসারে বিনিময়ের মাধ্যম নির্বাচিত হইল। বস্তুর সেই ধর্মগুলি হইল, স্থায়িত্ব (Durability), সর্বজনগ্রাহ্যতা (Acceptibility), স্থানান্তকরণের সুবিধা (Portability) প্রভৃতি। এই বিনিময়ের মাধ্যমগুলিরও একটি মূল্যমান নির্ণীত হইল দুইটি ধর্ম অনুসারে। তাহা হইল, দুষ্প্রাপ্যতা ও আকর্ষণী শক্তি। সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য হইলেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। তখন সে দ্রব্যের কোন ব্যবহারিক মূল্য না থাকিলেও শুধুমাত্র দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই তাহা দুর্মূল্য হইয়া উঠে। ইহার উপর তাহার যদি আকর্ষণী শক্তি থাকে তাহা হইলে তাহার একটি ব্যবহারিক মূল্যও আরোপিত হয়। অন্ন, জল, আমরা যে ভাবে ব্যবহার করি, স্বর্ণকে সেভাবে ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু স্বর্ণের আকর্ষণী শক্তির জন্য তাহাকে আমরা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। আবার আকর্ষণী শক্তি থাকিলেও যদি তাহা সহজলভ্য হয় তাহা হইলে তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। তখন বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতাই বস্তুর আকর্ষণী শক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। ঝিনুকের উপর বর্ণ-বৈচিত্র্য যতই নয়নরঞ্জন হউক না কেন, তাহা যে ঝিনুকের অন্তঃস্থিত মুক্তার চেয়ে অধিক সুদৃশ্য তাহা অনেক সৌন্দর্য-রসিকও বলিতে দ্বিধা করিবেন। একই কারণে নকল মুক্তা, মুক্তার সৌন্দর্যের যতই নকল করুক না কেন, আমাদের কাছে আসলটিই সুন্দর, কারণ তাহা শুধু সুন্দরই নয়, তাহা দুর্লভ। এককালে এল্যুমিনিয়ম যখন দুর্লভ ছিল, তখন তাহা নৃপতির শিরোভূষণ হইয়া থাকিত। পরে Hall সাহেবের আবিষ্কারে এই তীব্র এল্যুমিনিয়ম্-প্রীতি মানব-মন হইতে চলিয়া যায়। এইরূপে দেখি যাহা দুর্লভ, যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহা একটি বিশেষ মূল্য অর্জন করে এবং ইহাতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে তাহা মূল্যবান হইয়া উঠে। (অবশ্য যাহা নিতান্ত দুর্লভ যেমন হীরা, মুক্তা প্রভৃতি, সেগুলি পরিমাণের স্বল্পতার জন্য অধিক মূল্য অর্জন করে বটে কিন্তু নিত্য প্রয়োজনে বিনিময়-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হয় না, সে জন্য আরও সহজ লভ্য বস্তুর প্রয়োজন)। যখন এই বিনিময়ের মাধ্যমগুলির প্রচলন সুরু হইল, তখন সেই মাধ্যমগুলি বহু বস্তু-ভোগের উপায় হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাহা শুধুমাত্র দ্রব্য বিনিময়ের সুবিধার জন্যই ব্যবহৃত হইল না, মানুষ তখন সেগুলিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। সোনা তখন নিছক খনিজ পদার্থ নয়, তখন তাহা বহু বস্তু-ভোগের উপায়।

এখন, সমাজ-বন্ধনের ব্যবস্থায় এই বিনিময়ের মাধ্যমটিকে আমরা অস্বীকার

করিতে পারি না, কারণ অধুনা জীবন হইতে বস্তুগত ভোগকে বাদ দিবার উপায় নাই। অথচ এই বিনিময়ের মাধ্যমটি প্রাধান্য লাভ করিয়া পৃথিবীতে যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিনিময়-মাধ্যমটিই উপকরণ-প্রীতি চরিতার্থ করিবার উপায় হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ 'যক্ষপুরীর' সমাজ-জীবনে এই তীব্র স্বর্ণ-প্রীতি বা বস্তু-ভোগ স্পৃহার কথাই বলিয়াছেন। এই বস্তু-ভোগ-স্পৃহা নেশার মতন যক্ষপুরীর রাজাকে এবং সেখানকার অধিবাসীদের পাইয়া বসিয়াছে। এই বস্তু-ভোগ-স্পৃহা প্রয়োজনকে ছাড়িয়া অপ-প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছে এবং তাহাতে যক্ষপুরীর রাজ ভাণ্ডারে কেবল একের পর এক করিয়া সোনার তাল জমিয়া উঠিতেছে। বিশু বলে, "দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ওই সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ।" 'যক্ষপুরীর' রাজা হইতে খোদাইকর পর্যন্ত সকলেই এই সোনার মদের নেশায় মশগুল্। 'যক্ষপুরী'র এই স্বর্ণচূড়ার জ্যোতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, দূরের মানুষকেও আকর্ষণ করিয়া আপনার গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছে। এই স্বর্ণ-প্রীতিই এখানকার সমাজ-মনস্তত্ত্বের মূল কথা। এখানে জীবনের অন্য কোনরূপ মূল্য বোধ নাই, এখানে উপকরণই সম্পদ, স্বর্ণই ঐশ্বর্য। এখানে জীবন গড়িয়া উঠিতেছে স্বর্ণ-আহরণের উপযুক্ত যন্ত্র হইয়া, তাহারই যোগ্যতায় জীবনের মূল্যের স্বীকৃতি। এখানে স্ত্রী চাহিতেছে স্বামীর স্বর্ণ-আহরণের শক্তি যাচাই করিতে, তীব্র স্বর্ণ-তৃষ্ণায় অনুপযুক্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার বাধে না। যেখানে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যায় না, সেখানেও স্ত্রীর 'সোনার স্বপ্ন' স্বামীকে ভিতরে ভিতরে চাবুক মারে। যক্ষপুরীর অধিবাসীরা আপনাদিগকে এই স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া জীবনের এক প্রকার চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। যক্ষপুরীর রাজাও এই স্বর্ণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। অধ্যাপক বলে, "আমরা মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।" স্বর্ণের মধ্যে এই শক্তির উৎসটি কোথায় এবং তাহার রূপই বা কি সে কথা বুঝিয়া দেখা যাক্।

স্বর্ণের মধ্যে শক্তির উৎস হইল সেইখানে, যেখানে স্বর্ণের সাহায্যে আমরা জীবনের বিভিন্ন ভোগের উপকরণগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারি। এই শক্তির

রূপ হইল জীবনের বিশ্বগ্রাসী অস্তিত্বে। বিশ্বগ্রাসী অস্তিত্ব—অর্থাৎ যে অস্তিত্বে পৃথিবীর সব কিছু ভোগের মধ্যে লাভ করা যায়। বিশ্বকে এই ভোগের মধ্যে, এই হাতের মুঠার মধ্যে লাভ করিলে সেই ভোগজনিত পরিতৃপ্তি হইতে এক প্রকার শক্তির বোধ জন্মে। যক্ষপুরীর রাজা এই শক্তির অধিকারী, যক্ষপুরীর অধিবাসীরা এই শক্তির কাছে অবনত। এই শক্তিকে তাহারা শ্রদ্ধা করে, ভয় করে এবং কামনাও করে।

এই ভোগের বিষয়গুলির মধ্যে, বলাই বাহুল্য, কতকগুলি প্রাকৃতিক, কতকগুলি কৃত্রিম। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে, আপনার অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এই ভোগের উপকরণগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতি জীবন ধারণের জন্য সহজভাবে মানুষকে যাহা দিয়াছে, মানুষ তাহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, মানুষ ভোগের বিচিত্র উপকরণগুলি আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই সৃষ্টির বাসনা আপনার আবিষ্কারের অভিনবত্বে প্রয়োজনকে ছাড়িয়া অপ-প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছে এবং অন্তহীন লক্ষ্যের দিকে শ্রান্তিহীন প্রচেষ্টাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই যে অভিনব উপায়ে বিচিত্র উপকরণের সৃষ্টি, ইহার মধ্যে একটা চমৎকারিত্ব রহিয়াছে। এই সৃষ্টির দ্বারা যেন ভোগবৃত্তির তুচ্ছতা চাপা পড়িয়া যায়, ইহাতে মানুষ একপ্রকার মহিমা লাভ করে। যক্ষপুরীর রাজাকে নন্দিনী বলে, "অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হইনি। কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।"

আধুনিক সভ্যতার এই বস্তুরূপের মোহকে, এই স্বর্ণ-তৃষ্ণাকে আজ এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই, ইহার দীপ্তিও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, আমাদের জীবনের দিগন্তকে ইহা অপূর্ব রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

এই স্বর্ণ-জ্যোতি আমাদের জীবনাকাশ অধিকার করিয়া রাখাতে আমাদের জীবন সূর্যালোক হইতে বঞ্চিত, আমাদের জীবনে নানা বিকৃতি দেখা দিয়াছে।

'রক্তকরবী' নাটকে জীবনের এই বিকৃতিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দিক হইতে দেখিয়াছেন তাঁহা বুঝিতে হইবে। ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিমানসটির পরিচয় লওয়া প্রয়োজন। জীবন সম্বন্ধে কবির বিশেষ attitudeটি কি তাহা জানিতে হইবে, জীবনের সুখ-দুঃখকে কবি কি

ভাবে দেখিয়াছেন এবং কতদূর পর্যন্ত সেগুলিকে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে কবির জীবন-জিজ্ঞাসার ভূমিকায় বিষয়টিকে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পাইব। কবির এই জীবন-জিজ্ঞাসাটি বিশাল-পরিসর রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। তাহার মধ্য হইতে ইহাকে সামগ্রিকভাবে উদ্ধার করা রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে সাধনার বিষয়। এখানে আলোচ্য বিষয়ের আনুকূল্যে কবির সেই জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে কয়েকটিমাত্র কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনা রূপের মধ্যে রূপাতীতকে দেখিবার সাধনা। এই রূপাতীতকেও রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ অর্থে স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। মানুষের পরিচয়কে, মানুষের ইতিহাসকে বিশ্বজনীন কর্মে ও দানে বহুদিন ধরে মহাপুরুষরা গড়ে তুলছেন। তাঁরা তাঁদের দানে ভাবীকালের দিকে এবং সর্বদেশের দিকে আমাদের প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ বুঝেছে যে সে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। তাঁরাই প্রমাণ করেছেন সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক মানুষ বিরাজিত।" এই যে 'এক মানুষ' ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'মানবিক ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। এই 'মানবিক ব্রহ্ম' একটি রূপ-নিরপেক্ষ ভাবসত্তা, কিন্তু রূপের মধ্য দিয়াই ইহার প্রকাশ। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ ততটুকু পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যতটুকু পর্যন্ত তাহা রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে অথবা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ রূপ-নিরপেক্ষ ভাবসত্তাকে স্বীকার করিয়াছেন এ কথা না বলিয়া, রূপ যেখানে রূপ-নিরপেক্ষ ভাবসত্তাকে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছে, রূপের সেই বিস্তৃততর পরিবেশটিকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এই কথা বলাই শ্রেয়ঃ। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা তাই প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহত্তর বাস্তবতা। ইহাতে রূপ-নিরপেক্ষ যে ভাবসত্তার কথা থাকে তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া রূপাতীত, কিন্তু সত্যের দিক দিয়া তাহা একটি "বৃহত্তর রূপ।" এই-রূপগত সত্যের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ রূপাতীত তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছেন। রূপের মধ্যেই আছে রূপের চরম সত্য। রূপ যেখানে সেই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারে না,

রূপ সেখানে দীন, আর রূপ যেখানে সেই সত্যকে প্রকাশ করে তখন তাহা বৃহত্তর রূপের পরিচয় লাভ করে। ইহার জন্য রূপকে স্বীয় অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে হয় না, রূপ আপন সীমার মধ্যেই সেই অসীমের মহিমাকে প্রকাশ করে। রূপ তখন অরূপতা লাভ করে না, একটি অপরূপতা লাভ করে।

এই বৃহত্তর বাস্তবের ভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখকে দেখিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে আমাদের আধিভৌতিক জীবনের সুখ-দুঃখ চাপা পড়িয়া যায় নাই, পরন্তু সেই সুখ-দুঃখগুলিই আরও একটু বিস্তৃততর পরিধি লাভ করিয়াছে। জীবনের সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রটিকে স্বীকার করিতে না পারিয়া আমরা অনেক সময় সেগুলিকে বুঝিতে পারি না। আধ্যাত্মিকতার 'অপবাদে' কবিকে escapist বলিয়া থাকি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কদাচ আধিভৌতিক জীবনের সুখ-দুঃখকে এড়াইয়া যাইবার কথা বলেন নাই। তিনি সেগুলিকে অতিক্রম করিবার কথা বলিয়াছেন। অতিক্রম করা আর অস্বীকার করা এক বিষয় নহে। অস্বীকার অর্থে বুঝি যাহা আছে তাহাকে নাই বলা, আর অতিক্রম অর্থে বুঝি যাহা আছে তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহার বাহিরে পদক্ষেপ করা [অতি (বাহির)+ক্রম্ (পদক্ষেপ করা)+আ]। এই বাহিরও একটি অবাস্তব, অসম্ভব জগৎ নয়, তাহাও সাধনা দ্বারা আমাদেরই জীবনে বৃহত্তর রূপে লভ্য একটি বৃহত্তর বাস্তব জগৎ। রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসায় জীবনের এই স্বীকৃতি এবং জীবনের এই অতিক্রমণ উভয়ই রহিয়াছে। পরন্তু এই স্বীকৃতির কথাটি আছে বলিয়াই অতিক্রমণের বিষয়টি কবি-মানসে অভিনব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসায় জীবনের এই স্বীকৃতি ও অতিক্রমণটিকে বুঝিতে না পারিলে কবি-মানসের পরিচয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা 'কথা' কাব্য হইতে 'সামান্য ক্ষতি' এবং 'স্পর্শমণি' শীর্ষক কবিতা দুইটির বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়া কবিমানসের পরিচয়টি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব। প্রথম কবিতায় দেখি, কবি কাশীরাজ মহিষী করুণার সংকীর্ণ জীবন-বোধের কথা বলিয়াছেন। আপনার স্বার্থগত জীবনের প্ররোচনায় সে প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছে, সখী মালতীর সকরুণ আবেদন তাহাকে স্পর্শও করে নাই, শীতের প্রকোপ দূর করিতে স্থূল আত্মসুখের জন্য দুঃখী প্রজার গৃহ জ্বালাইয়া দিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে যে দুঃখের কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনের অতি বাস্তব দুঃখ। কিন্তু রাজ মহিষীর এই দুঃখেরও বোধ নাই। প্রভূত বিলাসোপকরণের মধ্যে আত্মসুখে মগ্ন হইয়া সে 'দীনের কুটিরে দীনের কি হানি' বুঝিতে পারে না।

মহিষী করুণা যে জীবনে আছে, জীবনের সত্য তাহার মধ্যে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর জীবনে উন্নীত করিতে চাহিয়াছেন। এই উন্নতি আসিবে বাস্তব-জীবন-সাধনার মধ্য দিয়া, তাহাকে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ঘুরিতে হইবে দুঃখী প্রজাদের ভস্মীভূত গৃহ কয়টি পুনরায় গড়িয়া দিবার জন্য।

এখন মহিষীর প্রতি কাশীরাজের এই যে ব্যবহার ইহাকে অনেকে অবাস্তব বলিতে পারেন। বলিতে পারেন, আপন মহিষীকে এত সহজে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। মহিষীর প্রতি হৃদয়-দৌর্বল্যে মহিষীকে শাস্তি-দানের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রজাদের অর্থ সাহায্যে সন্তুষ্ট করিলেই বিষয়টি বোধহয় 'বাস্তব' হইয়া উঠিত। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে এত সংকীর্ণ অর্থে দেখেন নাই এবং জীবনের দুঃখবোধকেও এত ছোট করিয়া দেখেন নাই। কাশীরাজের দুঃখ-বোধের গভীরতায় ও মহত্ত্বে কাশীরাজের কাছে মহিষীর প্রতি এ আবেদন ন্যায্য ও বাস্তব বলিয়াই বোধ হইয়াছে। তাই রাণীর প্রতি আদেশ দিবার পূর্বে আদর্শ ও বাস্তবের কোন প্রকার সংঘাতই তিনি অনুভব করেন নাই, এবং রাজ চরিত্রের কোন দ্বন্দ্বও দেখানো হয় নাই।

আবার 'স্পর্শমণি' শীর্ষক কবিতাটিতে দেখি, বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর নিকট যে জীবনঠাকুর পার্থিব সম্পদের সন্ধানে আসিয়াছিল, স্পর্শমণি লাভ করিয়াও সে সেই সম্পদকে অবশেষে সম্পদ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। সনাতন গোস্বামীর নিরাসক্ত জীবন দেখিয়া তাহার মনে হইল, সে কোন্ সম্পদের অধিকারী হইলে স্পর্শমণিকেও উপেক্ষা করা যায়। এতদিন তাহার জীবনে দুঃখের যে বোধ ছিল তাহা হইল—

জমি জমা আছে কিছু করে আছি মাথা নিচু
অল্প-স্বল্প পাই,
ক্রিয়া কর্ম যজ্ঞ যাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।

—এই কিছু-না-থাকা, এই অভাববোধ তাহাকে পীড়িত করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে মহিমান্বিত করে নাই। অন্য আর এক না-পাওয়ার বোধ, তাহার মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া কবি তাহাকে একটি মহিমা দিতে চাহিয়াছেন। এই পাওয়ার স্বরূপটিকে রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যাখ্যা করেন নাই, শুধু সনাতন গোস্বামীর সন্ন্যাস-জীবনের ব্যঞ্জনায় তাহাকে আভাসে জানাইতে চাহিয়াছেন। জানাইতে চাহিয়াছেন, আসক্তিতে শান্তি নাই, নিরাসক্তিতেই শান্তি; ভোগের মধ্যেই সম্পদকে চরম করিয়া পাওয়া যায় না, চরম সম্পদ রহিয়াছে ত্যাগের ভূমিকায়; বস্তুগত পাওয়াগুলি ক্ষণিক, অন্তে তাহা অতৃপ্তি বহন করিয়া আনে, এই পাওয়ার মধ্যে, এই অতৃপ্তির মধ্যে জীবনের সার্থকতা নাই, জীবনের সার্থকতায় পাওয়ার আর একটি রূপ আছে, তৃপ্তির আর একটি অবস্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ সেই পাওয়ার মধ্যে জীবনঠাকুরকে উন্নীত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ইহা মানবজীবনের একটি বৃহত্তর সাধনা, ইহা মানব-জীবনের অতীত কিছু নহে।

রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে বিকৃতির কথা বলিয়াছেন, সে বিকৃতিকে তিনি একটি বৃহত্তর জীবনের ভূমিকায় দেখিয়াছেন। সেখানে জীবনের সমস্যাগুলিকে কবি তাই একটি বিশেষরূপে দেখিয়াছেন এবং সেগুলির সমাধানের কথাও সেইভাবেই বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া সে সমস্যাগুলি অবাস্তব হইয়া যায় নাই বা তাহাদের গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে নাই এবং কবিগুরুও জীবনের বিকৃতিগুলি দূর করিয়া জীবনের মধ্যে কোন কল্পলোক সৃজন করিতে চাহেন নাই। কবি আমাদের এই জীবনকেই স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার বিকৃতিগুলি দূর করিয়া তাহাকে আরও একটু বড়ো করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রমানসের একটি চিন্তাকে উদ্ধৃত করিব, তাহা হইলে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। সমাজে কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে (১ম খণ্ড) কবি বলিতেছেন,—

"সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তি লাভ করে, মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি, প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার

রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব, মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি, তাহলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়। সমাজকে একটি প্রকাণ্ড এঞ্জিনওয়ালা কারখানা বলে মানতে হয়; ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এইরকম অত্যন্ত প্রয়োজনওয়ালা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপার পাত্র সন্দেহ নেই।

—সংসারের এই বন্দী-শাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে। সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙ্গে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কি? আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ-বিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই, আমি বনে গিয়ে ফল-মূল খেয়ে থাকব।

কিন্তু, বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এত বড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোনখানে? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানব-সমাজের মূলগত নয়, প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়, তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব, 'প্রেম! আঃ! বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই। কেননা প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে আমারই তত্ত্ব। অতএব, প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।' —যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।"

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে জীবন সম্বন্ধে কবির attitudeটি কি, কবি কী ভাবে জীবনের সমস্যা ও তাহার সমাধানের কথা চিন্তা করিয়াছেন। 'প্রেমের দ্বারা প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হওয়া'—'রক্তকরবী' নাটকে কবি তো এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। এই প্রেমের বোধে জীবনের বিকৃতিগুলি একটি বিশিষ্টরূপে

ধরা পড়ে এবং বিকৃত জীবনের মধ্যে একটি বৃহত্তর বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র রচিত হইয়া যায়। রক্তকরবী নাটকে বিকৃত সমাজ-জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কবি দেখাইয়াছেন যে, কী ভাবে যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহাদের সৌন্দর্য-বোধ কী পরিমাণে লোপ পাইয়াছে, তাহাদের প্রাণশক্তি কতখানি নষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য-বোধের অভাব, প্রেম-বোধের অভাব, প্রাণ-শক্তির হ্রাস, আনন্দানুভূতির সংকীর্ণতা—যক্ষপুরীর জীবনের বিকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ এই দিক হইতে দেখাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বৃহত্তর জীবনোপলব্ধির অভাবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি হইতে রস পাই না। ইহাকে আদর্শবাদী 'কবি কল্পনার চঞ্চল অনিশ্চিত আলোকপাত' বলিয়া মনে করি এবং আমাদের 'বাস্তব জীবন বোধের' সহিত মিলাইতে না পারিয়া কবি-প্রতিভার দানটিকে ব্যর্থ বলিয়া গণ্য করি।

যক্ষপুরীর সমাজ-জীবনের বিকৃতির রূপটি উপস্থিত করিবার পূর্বে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের চিত্রিত আধুনিক সভ্যতার 'যক্ষপুরীর' বিকৃত রূপটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে : এ যেন আমি সহিতেই পারি না।...সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রখর সূর্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নিচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্যন্ত কেহ নাই। সরকারি কাজ, মাটি কাটা বন্ধ থাকিতে পারে না, হপ্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে। অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই ত ছেলে। গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমন ধারা নয়। কিন্তু এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে, সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলাকে কেবল উদয়াস্ত মাটি কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রকের উপর জমা করা হইয়াছে, এখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকী নাই! শুধু মাটি কাটা, শুধু মজুরি। সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।"

যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের অভাব কবিকে পীড়িত করিয়াছে। কবি তাহাদের স্বর্ণ-তৃষ্ণাকে দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে আলোক-তৃষ্ণা আনিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের জীবনে স্বর্ণের যে প্রয়োজন আছে এ কথাকে তো অস্বীকার করা চলে না। স্বর্ণের প্রয়োজন হইতেই স্বর্ণের তৃষ্ণা জাগিয়াছে (এখানে স্বর্ণ বলিতে ব্যাপক অর্থে জীবনভোগের বিচিত্র বিষয়গুলির কথাই বুঝিব) এবং জীবনে স্বর্ণের প্রয়োজন যতদিন থাকিবে ততদিন স্বর্ণের তৃষ্ণা দূর করিবার কথা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিবে না। উদরে যখন অন্নাভাব, তখন আলো পান করিবার কথা উপহাসে পরিণত হয়, ইহার মধ্যে আমরা জীবনের কোন কাব্য অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু বাস্তব সত্যকে আধ্যাত্মিক সত্যের দ্বারা চাপা দেওয়া যায় না। স্বর্ণ-তৃষ্ণা দূর করিবার কথা তখনই বলা চলিতে পারে যখন স্বর্ণের আর প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু স্বর্ণের প্রয়োজন থাকিবে না—জীবনে আমরা এ কথাটিকে কেমন করিয়া সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি? সামাজিকভাবে জীবনযাপনের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন সব সময়েই থাকিবে। তাহা হইলে স্বর্ণের প্রয়োজন থাকিবে অথচ স্বর্ণের তৃষ্ণা থাকিবে না, ইহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

বিষয়টিকে দুইদিক দিয়া ভাবিয়া দেখা যায়। প্রথমতঃ, সামাজিক ব্যবস্থায় স্বর্ণকে এমন ভাবে ব্যবস্থিত করিতে হইবে যে, স্বর্ণের অভাব ব্যক্তিগতভাবে জীবনে অনুভূত হইবে না, আলো বাতাসেব মত তাহা সকলের পক্ষেই সমানভাবে সহজলভ্য হইয়া উঠিবে। শিশুকে যেমন তাহার প্রয়োজনীয় ভোগ্য বিষয়ের জন্য ভাবিতে হয় না, তাহাব পিতামাতাই সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহার অভাব তাহাকে জানিতে দেন না, তেমনি সামাজিকভাবে আমাদের স্বর্ণের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিলে স্বর্ণের অভাব আমাদের মধ্যে তেমনভাবে স্বর্ণতৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা হইতে মনকে ফিরাইতে হইবে, নতুবা প্রয়োজন যতই মিটানো যাক না কেন, স্বর্ণতৃষ্ণা একটার পর একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া চলিবে। স্বর্ণতৃষ্ণা দূর করিবার জন্য প্রথম পন্থাটি বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয় পন্থাটি আধ্যাত্মিক। প্রথমটিতে স্বর্ণের অভাব দূর করা যায়, কিন্তু স্বর্ণতৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না; দ্বিতীয়টিতে স্বর্ণতৃষ্ণা দূর করার চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা তখনই সফল হইতে পারে, যখন স্বর্ণের

অভাব দূর করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে। নতুবা কবি দক্ষিণা বাতাসের যতই গুণগান করুন না কেন, বিজলীর বাতাস হইতে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ কিছুতেই মিটিতে চাহিবে না, বিশেষ করিয়া যদি দেখিতে পাই যে বৈশাখের রৌদ্রে টিনের শেডের অগ্নিকুণ্ডের অনতিদূরেই "এয়ার কন্‌ডিশন্‌ড্‌" সৌধ স্বর্গপুরী রচনা করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ প্রয়োজন না মিটাইলে তৃষ্ণা দূর করিতে বলা চলে না। অভাব ও তৃষ্ণা এই কথা দুইটির মধ্যে একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। অভাব জাগে প্রয়োজন হইতে, তৃষ্ণা জাগে অচরিতার্থ বাসনা হইতে। প্রয়োজন মিটাইলে অভাব দূর হয়, তৃষ্ণা আপনার স্বভাবে কেবলই অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে। বিশুর কথায়—"দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই।" এখন, অভাব হইতে একপ্রকার বিকৃতি জাগে, আবার তৃষ্ণা হইতে আর একপ্রকার বিকৃতি জাগে। রবীন্দ্রনাথ এখানে স্বর্ণের অভাব ও তজ্জনিত বিকৃতির কথা না বলিয়া স্বর্ণের তৃষ্ণা ও তজ্জনিত বিকৃতির কথাই বলিয়াছেন। তাই এই স্বর্ণতৃষ্ণা দূর করিবার জন্য তিনি যে পন্থার কথা বলিয়াছেন তাহার প্রকৃতি আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে জীবনে স্বর্ণের অভাব ও তজ্জনিত বিকৃতির গুরুত্বকে স্বীকার করেন না তাহা নহে, এবং সেই অভাব ও বিকৃতি দূর করিবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পন্থাও যে তাঁহার কাছে অনাদৃত, অবহেলিত হইত সে কথা বলা চলে না। বিষয়টিকে এই দিক হইতে ধরিতে না পারিয়া আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথ বুঝি আমাদের 'বাস্তব জীবনের' সুখ-দুঃখকে এড়াইয়া গেলেন এবং অন্নের চাহিদাকে অস্বীকার করিয়া ফুলের চাহিদা লইয়া কবিজনোচিত রোমাণ্টিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা ভুল কথা আর কিছু নাই। যক্ষপুরীর বস্তিতে সরকারি খরচে চৌকিদারের ব্যবস্থা হইতে পারে, হয়তো বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ব্যবস্থায় বিজলীর বাতাসও সেখানে বহিতে পারে, কিন্তু স্বর্ণতৃষ্ণা তাহাতে দূর হইবে কি? তাহার জন্য মনের গতিই যে বদলাইতে হইবে; তাহার জন্য স্বর্ণের প্রতি কিছুটা বৈরাগ্যও যে প্রয়োজন। এই শেষের পন্থাটি, এই বৈরাগ্যের কথাটিই রবীন্দ্রনাথ এখানে বলিতে চাহিয়াছেন।

এই বৈরাগ্যকে রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণ-বিতৃষ্ণা রূপে নেতিবাচক করিয়া একটা

negative factor হিসাবে উপস্থিত করিতে চাহেন নাই, তাহাকে আলোক-তৃষ্ণা রূপে ইতি-বাচক করিয়া জীবনের মধ্যে একটি positive factor হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার মূলে কবি রবীন্দ্রনাথের যে জীবন-জিজ্ঞাসা রহিয়াছে, ইতিপূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এখন, এই আলোক-তৃষ্ণাও তৃষ্ণা, কিন্তু ইহা মানবকে বিশুদ্ধ আনন্দের পথে, তথা সহজ-জীবনের পথে লইয়া যায়। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মানবের স্বভাব কোন না কোন একটি সাধনার জন্য লালায়িত। এই সাধনাই একটি নেশার মতন, একটি তৃষ্ণার মতন তাহাকে পাইয়া বসে। অভাববোধ জীব-স্বভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তৃষ্ণার বোধটি মানবিক, তা সে-তৃষ্ণার প্রকৃতি যেমনই হউক না কেন। আধুনিক সভ্যতার যক্ষপুরীতে এই তৃষ্ণা যে বিকৃত পথ ধরিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার মোড়টি ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে সহজ জীবনের পথে চালিত করার কথা বলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রা ও বিশুর কথোপকথনটি উল্লেখযোগ্য—

চন্দ্রা। তোমাদের মতো জন্ম-মাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক ; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,—বলছে, কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে,—বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে।

আলোক-তৃষ্ণাকে কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রাণের মদের উপমায় ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। কবি নন্দিনীর মধ্য দিয়া যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে এই আলোক-তৃষ্ণাকে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। অধ্যাপক বলে—"সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধূলোর নয়, সে-যে আলোর।" অতঃপর আমরা এখানে 'আলোক-তৃষ্ণা' কথাটিকে আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। তাহা হইলে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের সহজ রূপটি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইবে এবং বুঝিতে পারিব যে নারীপ্রেমের মাধ্যমেই জীবনের সমস্যা ও বিকৃতিগুলিকে উত্তীর্ণ হইবার কথা রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। যক্ষপুরীর স্বরূপ বিশ্লেষণের এই অধ্যায়ে আমরা পূর্বোক্ত বিষয়টিকে শুধুমাত্র তত্ত্বের দিক দিয়া উপস্থিত

করিয়াই ক্ষান্ত হইব, পরে যথাস্থানে বিশুর প্রেম-মানসের বিশ্লেষণে তাহার প্রকৃতিটিকে আমাদের জীবনোপলব্ধির ভূমিকায় উপস্থিত করা যাইবে।

বিশেষের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ তাহাকেই তৃষ্ণা বলিতে পারি। তৃষ্ণার মধ্যে তাই একটি বিশেষ কিছু প্রাপ্তির কথা রহিয়াছে। এই বিশেষ যখন আয়ত্তের অতীত, তখন আকর্ষণটি তৃষ্ণায় পরিণত হয়। তৃষ্ণার মধ্যে এই বিশেষের অভাববোধ রহিয়াছে, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, যে তৃষ্ণার প্রকৃতিই হইল এই যে, বিশেষকে আয়ত্ত করিয়াই তৃষ্ণার শান্তি নাই, তৃষ্ণা তখন বিশেষান্তরকে আয়ত্ত করিয়া বলবত্তর হইয়া উঠিতে চায়। এইরূপে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের মধ্যে, এক প্রাপ্তি হইতে অন্য প্রাপ্তির মধ্যে তৃষ্ণা মানবচিত্তকে কেবলই ছুটাইয়া লইয়া চলে। মানবের দুইটি চিত্তবৃত্তি হইল এই তৃষ্ণার উপাদান—একটি হইল লোভ, অপরটি হইল কাম; একটিতে স্বর্ণ-তৃষ্ণা, অপরটিতে রূপ-তৃষ্ণা। ইহারা একই বস্তু-তৃষ্ণার দুই পিঠ।

তাহা হইলে 'আলোক-তৃষ্ণা' কাহাকে বলিব, আমাদের জীবনে ইহার রূপ কি, অবকাশই বা কোথায়?

স্বর্ণ অর্থে যেমন জীবন-যাপনের বিচিত্র উপকরণগুলিকে বুঝি, রূপ অর্থে যেমন ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলিকে বুঝি, আলোক অর্থে তেমন কোন বিশেষ বস্তুগত অস্তিত্বকে বুঝিব না। আলোকের চরম সত্য কোন বিষয়ের মধ্যে নাই, তাহা রহিয়াছে বিষয়ীর মধ্যে। ব্যাপ্তির মধ্যে, উদার উন্মুক্তির মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশে আলোক-তত্ত্ব নিহিত আছে। যখন আমাদের চিত্ত কোন বিশেষকে একান্তভাবে কামনা করে না, পরন্তু নির্বিশেষের মধ্যে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া একটি স্থির শান্ত সমাহিত আনন্দ অনুভব করে, তখনই আমাদের আলোক-দর্শন ঘটে। ইহার মধ্যে কোন বিশেষের প্রতি আকর্ষণের কথা নাই, বিশেষের প্রাপ্তির কথাও নাই, এখানে একটি ভাবোপলব্ধির, একটি রসাবেগের, আস্বাদনের কথা রহিয়াছে। আলোক অর্থে তাই বাহিরের কোন বিষয় নহে, তাহা আমাদেরই অন্তরের একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ। ইহার মধ্যে কোন বিশেষ চিত্তবৃত্তির কথা নাই, ইহা হইল আমাদের সমগ্র সত্তার আত্মোপলব্ধি জনিত একটি ভাব-দ্যুতি। ইহা হইল আমাদের প্রেম, সর্বজীবনগত প্রেম।

আমাদের চিত্ত যখন কোন বিশেষের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে আবদ্ধ না করিয়া নির্বিশেষের ধ্যানে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়, তখন সেই

আত্মবিস্মৃতির মধ্যে আমাদের প্রেমের আস্বাদন ঘটে, আলোক-দর্শন ঘটে। ইহা আমাদের আত্মপ্রকাশের একটি অবস্থা, আত্মোপলব্ধির একটি সংজ্ঞা। গীতিমাল্যের একটি কবিতায় কবিগুরু এই আলোক-দর্শনের বিষয়টিকে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম—

জীবন স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে
কোন্ আলো ঐ বেড়ায় দুলে?
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই
বসে বসে বিজন কূলে।

ভাসে তবু যায় না ভেসে,
হাসে আমার কাছে এসে,
দু-হাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই
মনে করি আনব তুলে।

শান্ত হ রে শান্ত হ মন,
ধরতে গেলে দেয় না ধরা—
নয় সে মণি নয় সে মানিক
নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া।

দূরে কাছে আগে পাছে,
মিলিয়ে আছে ছেয়ে আছে,
জীবন হতে ছানিয়ে তারে
তুলতে গেলে মরবি ভুলে।

তাহা হইলে দেখিলাম 'আলোক' অর্থে আর কিছুই নহে,—আলো হইল প্রেম। এই প্রেমের মধ্যে বিশেষের জন্য কোন তৃষ্ণা নাই, ইহার মধ্যে আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-প্রকাশের কথাই রহিয়াছে।

তাহা হইলে 'আলোকে'র সহিত তো তৃষ্ণা কথাটিকে আমরা যুক্ত করিতে পারি না। 'আলোক-তৃষ্ণা' কথাটির মধ্যে অর্থ-বৈষম্য ঘটিয়া যায়। বস্তুতঃ পক্ষে বিষয়টি সত্য। আমরা ইতিপূর্বে 'স্বর্ণ-তৃষ্ণা' ও 'রূপ-তৃষ্ণা'র সহিত মিল রাখিয়া 'আলোক-তৃষ্ণা' কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কথাটি সত্য নহে। অথচ প্রেম যখন লাভ করি নাই, যখন জীবনে বহু বিরোধের মধ্য দিয়া, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া পথ চলিতেছি, তখনও প্রেমের জন্য একটি

ব্যাকুলতা থাকিয়া যায় এবং এই ব্যাকুলতাটি আত্ম-বিকাশের সহায় হয়। এই ব্যাকুলতার মধ্যে একটি যেন তৃষ্ণার ভাব রহিয়াছে। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ তৃষ্ণা না বলিয়া আকাঙ্খা বলিয়াছেন। যতক্ষণ প্রেম-সমাধি লাভ করি নাই ততক্ষণ এই আকাঙ্খা বিশেষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ এখানে উপলক্ষ মাত্র, প্রেম-সমাধি লাভ করিলে চিত্ত বিশেষকে অতিক্রম করিয়া যায়। জীবনে যখন প্রেমের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, তখন প্রেমের জন্য এই আকাঙ্ক্ষাটি সেই বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। বনের সবুজ, রোদের সোনা তাহাদের মায়া বিস্তার করিয়া চিত্তকে কেবলই বিশেষের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নির্বিশেষের আনন্দ-মুক্তির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়। বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট হইতে আমাদের নিকট সেই ছুটির নিমন্ত্রণ আসিয়া উপস্থিত হয়। যক্ষপুরীতে বিকৃতির নানা বন্ধনের মধ্য হইতে বিশু সেই ছুটির বাণীকে ঘোষণা করিয়াছে। আলোক-দর্শনে, প্রেমের উপলব্ধিতে এই যে জীবনের মুক্তি ঘটে, জীবন যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিস্তৃত হইয়া যায়, বিশ্বের এক আনন্দ-মূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়,—'অচলায়তন' নাটকে কবিগুরু তাহার একটি অপূর্ব চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে বিষয়বস্তুর ঐক্যের জন্য সেই চিত্রটিকে নিম্নে উপস্থিত করিলাম।—

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন।

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি।

দ্বিতীয় বালক। আজ চারদিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনদিন দেখি নি।

… … …

প্রথম বালক। দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি।

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পঞ্চক দাদার সেই গানটা কেবলই আমরা গেয়ে বেড়াচ্ছি।

জয়োত্তম। কোন্ গান।

প্রথম বালক। সেই যে—

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি
সুর নদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।



'অচলায়তন' নাটকে গুরুর মধ্য দিয়া আলোকের বাণী অচলায়তনের অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে; 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনীর মধ্য দিয়া আলোকের বাণী যক্ষপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন আমরা অধ্যাপকের কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে পারিব। অধ্যাপক বলিয়াছে, নন্দিনী ধূলোর সোনা নয়, আলোর সোনা ; তাহাকে প্রয়োজনের বাঁধনে বাঁধিবে

কে ? ধূলোর সোনা অর্থে স্বর্ণ-তৃষ্ণা বা রূপ-তৃষ্ণার বিষয়। সে বিষয় আমাদের মধ্যে নিত্য অভাববোধ জাগাইয়া তোলে এবং সেই অভাব হইতে প্রয়োজনের বন্ধন সৃষ্টি হয়। রূপ-তৃষ্ণা হইতে ইন্দ্রিয়-ভোগের যে প্রয়োজন জাগে, নন্দিনীকে সে প্রয়োজনের মধ্যেও বাঁধিতে পারা যায় না। নন্দিনী আমাদের মধ্যে প্রেমকে জাগাইয়া তোলে, আনন্দের সঞ্চার করে। এই প্রেমের সম্বন্ধে তো প্রয়োজনের বন্ধন নাই, তৃষ্ণার আবেদন নাই। তাহাকে দেখিয়াই আনন্দ, তাহাকে ভাবিয়াই আনন্দ, তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই আনন্দ। এই আনন্দে জীবনের যে মুক্তি ঘটে, কবিগুরু নারীপ্রেমের মধ্য দিয়া জীবনের সেই মুক্তির কথা বলিয়াছেন, জীবনের বিকৃতিজাত বহু সমস্যার সমাধানের কথা বলিয়াছেন। [এইখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে নারীর সহিত পুরুষের যৌবনের যে উদ্দাম-বাসনার সম্বন্ধ, ভোগের মধ্যে যাহার প্রতিষ্ঠা এবং যাহার মধ্যে নারী আপনার নারীধর্মকে অনেকাংশে অনুভব করে, নন্দিনী ও রঞ্জনের সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সে কথা বলা হইয়াছে। এই দিকটি নন্দিনীর পল্লীজীবনের ঘটনা। যক্ষপুরীর নন্দিনীকে প্রেমের এই দিক হইতে দেখানো হয় নাই। নন্দিনীর প্রেম-মানসের বিশ্লেষণে যথাস্থানে ইহার আলোচনা করা যাইবে।] বিশুর প্রেম-মানসের পরিচয়ে এই মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব, অতঃপর যক্ষপুরীর জীবনের বিকৃতিগুলিকে বুঝিয়া দেখা যাক।

স্বর্ণ-তৃষ্ণার মধ্য দিয়া জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে গিয়া যক্ষপুরীতে জীবনকে কী ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়াছেন। জীবনের মধ্যে উপকরণকে প্রাধান্য দিয়া সেখানে মানুষকেও উপকরণের ন্যায় গণ্য করা হয়। জীবন সেখানে বহু বস্তু-ভোগ-সুখের সমষ্টি, মানুষ সেখানে ভোগোপকরণ সৃষ্টি করিবার উপায়। প্রেম ও আনন্দের মধ্যে মানুষের যে একটি পৃথক অস্তিত্ব আছে, যে-অস্তিত্ব স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে, যাহা বস্তু-ভোগের ঐকান্তিকতাকে অতিক্রম করিয়া জীবনের সহিত একটি সূক্ষ্ম মানসিক ভোগের সম্বন্ধ পাতাইতে চায়, সেই অস্তিত্বকে এখানে অস্বীকার করিয়া বস্তু-ভোগগত জীবনের অস্তিত্বকেই চরম করিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুগত ভোগের প্রয়োজন যে জীবনে নাই তাহা নহে, কিন্তু জীবনের একটি মানসিক ভোগের দিকও রহিয়াছে। ইহা হইল জীবনে সৌন্দর্যোপলব্ধির দিক, তথা প্রেমের দিক, তথা বিশুদ্ধ আনন্দের দিক। এই উভয়ের সামঞ্জস্যে জীবনের সম্পূর্ণতা। যক্ষপুরীর সমাজ-ব্যবস্থায় জীবনের এই প্রেমের দিকটিকে চাপা

দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ জীবনের সহিত এই প্রেমের সম্বন্ধ আত্মিক, ইহাতে বস্তুগত জীবনের কোনও লাভ নাই; ইহাতে জীবন পায় না কিছুই, পরন্তু ইহাতে জীবন আপনাকে দান করে। এই দান আপনার স্বার্থ ত্যাগের মধ্যে, তীব্র স্বর্ণ-তৃষ্ণাকে দমিত করার মধ্যে। এই আত্মিক যোগের দ্বারা জীবনের যে মানসিক ভোগ এবং সেই মানসিক ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে যে বৃহত্তর-বাস্তব-ভোগ তাহার স্বাদ যক্ষপুরীর অধিবাসীরা জানে না। তাই এ সকল কথা তাহাদের নিকট দুর্বোধ্য। জীবনের এই দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া শুধুমাত্র বস্তুগত ভোগকে অবলম্বন করিয়া প্রবল স্বর্ণ-তৃষ্ণায় তাহাদের জীবন একটি বিকৃত পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

জীবনে যখন স্বর্ণতৃষ্ণা একান্ত হইয়া উঠে তখন মানুষকেও সেই স্বর্ণের মাধ্যমে দেখিয়া থাকি; তাহাকে স্বরূপে দেখিতে পাই না। যক্ষপুরীর সমাজেও মানুষকে সেই ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সামাজিক প্রয়োজনে মানুষের যতটুকু প্রয়োজন, মানুষকে ঠিক ততটুকু পরিমাণেই গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইয়াছে। এই সামাজিক প্রয়োজনটি হইল স্বার্থের প্রয়োজন—স্বর্ণ-আহরণের প্রয়োজন। যাহার দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, যক্ষপুরীতে তাহার কোন মূল্য নিরূপণ করা হয় নাই। তাহাকে যক্ষপুরী হইতে নির্বাসন দেওয়া হয়। এখানে তাই মানুষের এক একটি বিশেষ পরিচয়, কেহ সর্দার, কেহ গোঁসাই, কেহ অধ্যাপক, কেহ বা খোদাইকর। যে যে-ভাবে সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে, তাহার সেইরূপ পরিচয়। এই প্রয়োজন সিদ্ধির গুরুত্ব অনুযায়ী জীবনের শ্রেণী বিভাগ। এই প্রয়োজনের অন্তরালে যদি কাহারও মধ্যে কোন অপ্রয়োজনের অস্তিত্ব থাকে, তবে যক্ষপুরীর পেষণে সেই অস্তিত্বের মৃত্যু ঘটে। গজু পালোয়ানের দুর্দশা দেখিয়া নন্দিনী বলিয়াছিল—

নন্দিনী। গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকী।

গোঁসাই। সব দিক ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে।

নন্দিনী। এ-রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচার আছে?

গোঁসাই। আছে বই-কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগ-বাটোয়ারা করতে হয়।

জীবনের এই হিসাব, জীবনের এই ভাগ-বাটোয়ারা যক্ষপুরীর সমাজনীতির মূলকথা। হিসাবমতো মানুষকে কাজে লাগাইয়া, মানুষকে যন্ত্রের মতো, উপকরণের মতো ব্যবহার করিয়া যক্ষপুরী আপনার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। যক্ষপুরী অধ্যাপকের নিকট হইতে পাণ্ডিত্য, শ্রমিকের নিকট হইতে শ্রম, সর্দারের নিকট হইতে সর্দারি, গোঁসাইয়ের নিকট হইতে ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি আদায় করিয়া থাকে। এইরূপে মানুষের মধ্যে যেখানে যতটুকু প্রয়োজনের বিষয় রহিয়াছে, যক্ষপুরী সেগুলিকে ছাঁকিয়া নিয়া আপনার শক্তি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই শক্তির রূপ অতি ভীষণ, ইহার প্রতাপ ভয়ঙ্কর। কিন্তু মানুষের মধ্য হইতে শুধুমাত্র এই শক্তির রসটুকু নিঙড়াইয়া বাহির করিতে গিয়া মানুষকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের যে-শক্তি প্রয়োজন সাধন করে, তাহা সহজ প্রাণধর্ম ও আনন্দ-ধর্মের সহিত মিশিয়া থাকিলে জীবনের ভার হাল্কা হইয়া যায়। তখনও জীবনের প্রয়োজনগুলি জীবন সাধিত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকাতে শক্তির রূঢ়তা নষ্ট হইয়া যায়, এবং শক্তির তীব্রতা সব কিছুকে ছাপাইয়া উঠে না। কিন্তু সহজ জীবনের স্বভাবে যে শক্তি পাওয়া যায়, যক্ষপুরী শক্তির সেই রূপে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আরও বেশী ফল লাভ করিবার জন্য জীবন হইতে শুধুমাত্র শক্তিটুকুকে ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে। ইহাতে জীবন বড়ই নিষ্প্রাণ ও দীন হইয়া পড়িয়াছে। জীবন যাহাদের ক্ষুদ্র, এই ক্ষতির ভাগ যখন তাহাদের উপর পড়িয়াছে, তখন তাহাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। যক্ষপুরীর শক্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক বলে—"সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।"

এই বড়ো হওয়ার তত্ত্বে যক্ষপুরীতে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞাও পৃথক। এখানে মনুষ্যত্ব স্বার্থপুষ্টিরই নামান্তর। মঙ্গলবোধের সহিত ইহার কোন রফা নাই। মানুষের শক্তি হরণ করিয়াই সে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, মানুষকে ভালবাসিয়া নহে, সেবা করিয়া নহে।

যক্ষপুরীর জীবনের এই সকল বিকৃতিগুলির একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়া রাখিয়াছে যক্ষপুরীর তথাকথিত ধর্মতত্ত্ব। যক্ষপুরীর সর্দার যক্ষপুরী হইতে ধর্মকে নির্বাসিত করে নাই, তাহাকেও কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছে।

সে ধর্মের কাজ হইল শ্রমিকদের মধ্য হইতে বিদ্রোহের শেষ উত্তাপটুকু শোষণ করিয়া লইয়া তাহাদের শান্ত করিয়া রাখা। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আবার ধর্মকে ফৌজের চাবুকের সাহায্য লইতে হয়। বিশু বলিয়াছে—

"যে রশিতে এই চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।"

কিন্তু যক্ষপুরীর অধিবাসীদের বন্ধন শুধুমাত্র বাহিরের দিকেই নহে, তাহাদের বন্ধন ভিতরের দিকেও রহিয়াছে, এবং সেই বন্ধনই সবচেয়ে শক্ত বন্ধন। প্রথম বন্ধন তো যক্ষপুরীর অধিবাসীদের নিদারুণ স্বর্ণ-তৃষ্ণা। দ্বিতীয়তঃ, যে সৌন্দর্যের বোধ, প্রেমের বোধ সেই স্বর্ণ-তৃষ্ণাকে লাঘব করিতে পারিত, উহাদের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব। নন্দিনীকে উহারা অনেকেই সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের এই দুর্ভাগ্যকে বিশু ধিক্কার দেয়। তৃতীয়তঃ, যক্ষপুরীর অধিবাসীরা সুন্দরকে যেমন ভুলিয়া গিয়াছে, মুক্তির আনন্দকেও তেমনি ভুলিয়া গিয়াছে। আজ তাই তাহারা ছুটি যাপন করিতে জানে না। যখন তাহাদিগকে মুক্তির বোধের কোনও অবকাশ দেওয়া হয়, তখন আত্মাকে ঘুম পাড়াইয়া কোন রকম করিয়া তাহারা সেই অবকাশটিকে ফুরাইয়া ফেলিতে চায়।

বাহিরের বন্ধনকে যক্ষপুরীর অধিবাসীরা মানিয়া লইয়াছিল, ভিতরের বন্ধন সম্বন্ধে তাহাদের কোন বোধ ছিল না,—এমন সময় নন্দিনীর আবির্ভাবে উভয়বিধ বন্ধনের পীড়ন তাহারা অনুভব করিতে লাগিল। বিশুর বিদ্রোহবাণী তাহাদিগকে ভিতরে ভিতরে আহ্বান করিতে লাগিল এবং পরিশেষে তাহারা সমবেত হইয়া যক্ষপুরীর বিধানের বিরুদ্ধে, গণ-বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। এইরূপে দেখি যক্ষপুরীর মুক্তি সংগ্রামকে রবীন্দ্রনাথ গণ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাকে কোন সাধকের একক আত্ম-সাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

কিন্তু যক্ষপুরীর অধিবাসীরা যখন বিদ্রোহী হইয়া রাজার বন্দীশালা ভাঙিতে চলিয়াছে, তখন তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের পথের পুরোভাগে রাজা স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বিদ্রোহীদের অন্যতম হইয়া। আমরা অতঃপর রাজার এই বিদ্রোহটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সপ্তম অধ্যায়

রাজার বিদ্রোহ

যক্ষপুরীর সমাজ-জীবনের কথা বলিয়াছি, অতঃপর যক্ষপুরীর রাজার বিদ্রোহের কথা বলিব। রাজার এই বিদ্রোহটিই 'রক্তকরবী' নাটকের নাট্য-বস্তুর প্রতিপাদ্য বিষয়। ইতিপূর্বে নাট্যকাহিনী প্রসঙ্গে এই বিদ্রোহের কিছুটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে বিদ্রোহের প্রকৃতিটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে আমরা নাট্যবস্তুর আরও গভীরে প্রবেশ করিতে পারিব এবং কবিগুরু কি নিমিত্ত যে এই অভিনব অন্তর্দ্বন্দ্বটির পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও আমাদের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে। 'রক্তকরবী' নাটকের যাহা ভাববস্তু,—বিকৃত-জীবন হইতে নারী-প্রেমের মধ্য দিয়া সহজ জীবনে উন্নতি—তাহাকে শিল্পরূপ দিতে গিয়া কবিগুরুকে এমনই একটি অভিনব অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে। যাহা সমাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় এবং যাহার মধ্যে একটি বৃহত্তর জীবনের তত্ত্ব রহিয়াছে, কবি তাহাকে যুক্তি-তর্কের অধিগত না করিয়া রসাস্বাদনের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে একদিক দিয়া কবির বক্তব্যটি যেমন একটি শিল্প-রূপ লাভ করিয়াছে, তেমনই তাহা রসের ভূমিকা লাভ করিয়া বুদ্ধির জগৎ হইতে বোধের জগতে, বিচার-বিতর্কের ক্ষেত্র হইতে আনন্দ-চেতনার ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। এই বোধের মধ্যে, এই আনন্দ-চেতনার মধ্যে আমাদের রসিক চিত্তের উন্নতি না ঘটিলে আমরা নাটকটির আবেদনটি গ্রহণ করিতে পারিব না, তাহার তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারিব না।

রাজার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে রাজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দ্বন্দ্বের বিষয়টিকে আমাদিগকে যথাযথ গুরুত্বের সহিত উপলব্ধি করিতে হইবে। জীবনের দ্বন্দ্বকে আবিষ্কার করাই হইল কবি প্রতিভার কাজ। আমাদের জীবনের দ্বন্দ্ব দেশে ও কালে এক একটি বিশেষ-রূপ লাভ করিয়া থাকে। কবি-প্রতিভা সেই দ্বন্দ্বটিকে শিল্পায়িত করে। কবি-রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকে বিশ্বজীবনের একটি দ্বন্দ্বকে শিল্প-রূপ দিয়াছেন। জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশ্বকবি জীবনের এই যে একটি অপূর্ব দ্বন্দ্বকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার জন্য সমস্ত বিশ্বজগৎকে তাঁহার কাছে একদিন ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে। আজ আমরা কবির কথা শুনিয়াও শুনিতেছি

না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছি না, কিন্তু শিল্পের আবরণে এই যে গভীর কথাটি কবি আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা শুধুমাত্র কবি-মানসের একটি রস-বিলাসের লীলা বলিয়া নহে, তাহার মধ্যে জীবনের বহুদিনের রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতায় একটি আনন্দময় বিশ্বাস ও আবেগময় স্বীকৃতি-পরিণতি লাভ করিয়াছে। আমাদের জীবনদ্বন্দ্বের এই বিষয়টি রবীন্দ্র-মানসের একটি বিশিষ্ট উপাদান। আমরা অতঃপর রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে ইহার কিছুটা পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব, তাহা হইলে ইহার বিস্তৃত পটভূমির কিয়দংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

উপনিষদের মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাটি কবি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আমাদের জীবনে উপকরণই যে সব নয়, উপকরণের উর্ধ্বে আমাদের জীবনের যে আর একটি অবলম্বন রহিয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া জীবন আর একটি মহত্তর পরিচয় লাভ করিতে পারে,—সেই প্রেমের অবলম্বনটিকে কবির অন্তরাত্মা আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে। মৈত্রেয়ীর সেই প্রার্থনাটির ব্যাখ্যায় 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে কবি বলিতেছেন—"আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন, আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই। স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পাচ্ছে না যে এ-সবে আমার কোনো ফল হবে না। সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এই-ই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে, হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরও-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয়, এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে। একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে একপাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

আমাদের জীবনের মধ্যে এই আকাঙ্খাটিকে কবি দেখিতে ও দেখাইতে

চাহিয়াছেন। কবি বলেন—"এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।"

আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতায় আমাদের জীবনে যখন স্বর্ণ-তৃষ্ণা একান্ত প্রবল হইয়া উঠিতেছে তখন প্রেমের জন্য এই প্রার্থনাটি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে না এবং জীবনের দ্বন্দ্বকে আমরা অনেক সময় এই দিক দিয়া স্বীকার করিতেও চাহিতেছি না। কবি কিন্তু আমাদের জীবনে এই দ্বন্দ্বটিকেই আবিষ্কার করিয়াছেন এবং আমাদিগকে তাহা নানাভাবে জানাইতে চাহিয়াছেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে দেখি, রাজা গোবিন্দ মাণিক্যকে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' করিয়া রাখেন নাই, তাঁহার মধ্যে এমনই একটি প্রার্থনাকে জাগাইয়া তুলিয়া তাঁহাকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছেন। রাজর্ষি বলিতেছেন—"হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎশিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম, তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিতাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।"

প্রেমের মধ্যে মহিমার এই যে একটি সর্বব্যাপী পরিচয়, ইহাকে রবীন্দ্রনাথ জীবনে অত্যন্ত সত্য করিয়া দেখিয়াছেন। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা মহিমার জন্য, শক্তির জন্য জীবনের যে সাধনাকে স্বীকার করিয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিণতিকে সার্থকতা রূপে মানিয়া লইতে চাহেন নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই স্বর্ণ-জ্যোতি দেখিয়া কবি 'নৈবেদ্য'তে বলিতেছেন—

"এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই শ্মশানের মাঝে শক্তির সাধনা
তব আরাধনা নহে, হে বিশ্বপালক।

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্বসিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব রিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল—ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায়।"

বিশ্বপালকের সেই নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোককে বিশ্বকবি এই পূর্বসিন্ধুতীরে বিশ্বজনের পক্ষ হইতে বন্দনা করিতে চাহিয়াছেন। এই বন্দনাটি ভাবপ্রবণ কবির একটি উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, তাহা একটি বিশিষ্ট জীবন-সাধনার সত্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সত্যটি যখন বিপরীত ভাবের সম্মুখীন হইয়াছে তখন কবি একটি স্থির সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহার দ্বন্দ্বটিকে অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা অতঃপর নিম্নে "শিক্ষার মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির দ্বারা কবি-চিত্তের এই দ্বন্দ্বটিকে এবং কবির সিদ্ধান্তটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সেখানে কবি বলিতেছেন,—

"পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে, কেন না বিদ্যা যে সত্য।

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর ক'রে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সঙ্কট ত'রে যাচ্ছে।......"

(কিন্তু) এই পর্যন্ত এগিয়ে একটি কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়— 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে, তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ!' না, পাইনি, সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানব-পুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে ব'ল্‌ছিনে—ইংরেজিতে বলতে হ'লে হয়-তো ব'লতেম, titanic wealth। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হ'লেন এক আর কুবের হ'লো আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে; কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা

ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলি লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে, তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরীর মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়।

"আটলান্টিকের ও-পারে ইট-পাথরের জঙ্গলে ব'সে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হ'য়ে বলেছে—'তালের খচমচের অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়?' আরো চাই, আরো চাই,—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন, সেই ভ্রূকুটী-কুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে 'ততঃ কিম্'।

"একথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে।...আমি বলিনে রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেখানে তৈরী হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ, এইখানে তা'র প্রাচীর, তা'র পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ—বস্তুকে নয়—আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

"...যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাইরে বড়ো ক'রে তোলায় পশ্চিম-সমাজে মানব সম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা স্ক্রু-দিয়ে-আঁটা, আঠা-দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে-আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ ক'রে কোঠাবাড়ী ওঠে।

"...ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে, সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে আর য়ুরোপে ব্যবহারের বাহ্য

বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে, সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট ক'রেছে।

"তাহলে চরিতার্থতা কোথায়? তা'র উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে।"

উপনিষদের মন্ত্রগুলি হইতে রবীন্দ্রনাথ এই একের প্রকাশ-তত্ত্বটিকে ঘোষণা করিয়াছেন—

যস্ত সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের কবি পশ্চিমকে নূতন জীবনবাণী শুনাইয়াছেন। কবি বলিতেছেন—"শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তা'র উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।

যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভুদবিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কশ্ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।'

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে 'শান্তি চাই'। এ কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য।"

রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলির দ্বারা এই কথাটিই জানাইতে চাহিতেছি যে, আমাদের জীবনের এই একটি দ্বন্দ্বের বিষয়কে কবি কত গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন, কেমন করিয়া তাহার সমাধানের কথা ভাবিয়াছেন। বিশ্বকবির এই চিন্তাটিকে অস্বীকার করিয়াও মিলের বাঁশি বাজিয়াছে, পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ীর উপর আরও পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ী উঠিয়াছে, তবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবি বলিয়া গিয়াছেন—"এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

এই বিনাশকে আমরা বাস্তবজীবনে সব সময় প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া ধর্মের, তথা প্রেমের জয়টিকে সব সময় মানিয়া লইতে চাহি না। তাই 'রক্তকরবী' নাটকে কবির শিল্প-প্রয়াসটিকে রোমান্টিক কবি-কল্পনার চঞ্চল অনিশ্চিত আলোকপাত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য এক নহে। বাস্তবজীবনে অনেক সময় কারণগুলি যে পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, কার্যগুলি সে পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না, সেখানে সূচনা থাকে, পরিণতি থাকে না। সাহিত্যিক তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে বৃহত্তর বাস্তবের ক্ষেত্র রচনা করিয়া কার্যকে সম্পাদিত করেন, পরিণতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কাজেই জীবনের যে-সত্য সাহিত্যের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে, বাস্তবজীবনে তাহাকে সেই পরিণত রূপে দেখিতে না পাইলে সাহিত্যিককে গাল পাড়িবার কারণ নাই। সেখানে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সেই পরিণতিটি যথার্থ আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কিনা এবং সাহিত্যিক তাহাকে কতখানি রসোত্তীর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই জীবনদ্বন্দ্বের একটি বিষয়কে রাজার চরিত্রের উপাদান করিয়া তুলিয়াছেন। যে পরিণতিকে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে একান্তভাবে আশা করিয়াছেন, রাজার চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহাকেই শিল্পের মধ্যে একটি রস-রূপ দান করিয়াছেন। ইহারই জন্য কবি রাজচরিত্রের মধ্যে অভিনব দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং নূতন শিল্প-ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছেন। কবি-প্রতিভার এই দানটিকে এমনই গুরুত্বের সহিত আমাদিগকে দেখিতে হইবে; তাহার মধ্যে যে মহাকাব্যের উপাদান রহিয়াছে সে কথা আমাদিগকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে এবং তাহার জন্য আমাদের জীবনের উপলব্ধিকে সেই পরিমাণে গভীর ও রসদৃষ্টিকে সেই পরিমাণে উদার করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা দেখিলাম, যাহা সমষ্টিগত ভাবে দুই জাতির সাধনা ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই রাজার চরিত্রের মধ্য দিয়া একক ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব করিয়া তুলিয়াছেন। তাই রাজাকে একটি প্রতীক বলিয়া ভ্রম হয়, রাজা যেন একটি বিশেষ ভাবের আধার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যক্তি-জীবনের দ্বন্দ্বের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন, রাজার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া রাজাকে মানবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব মনোজীবনের তত্ত্বের অধীন, আমরা অতঃপর রাজার এই মনোজীবনের দ্বন্দ্বটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

যক্ষপুরীর রাজার ডাকনাম মকররাজ; তাহার ভাল নাম···

ভাল নামটি লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। মকররাজ নিজেও ভুলিয়া গিয়াছে, কারণ বহুদিন হইল সেই নামটির ব্যবহার নাই। সে-নামটি ধরিয়া তাহাকে ডাকে এমন লোক যক্ষপুরীতে কেহ নাই।

মকররাজ নামটি রাজার ঠিক নাম নয়, এটা তাহার একটা উপাধি বিশেষ, অধিক ব্যবহারে নামে পরিণত হইয়া গিয়াছে। রাজা আপনার শক্তির সাধনায় এই উপাধিটি অর্জন করিয়াছে। নিজের এই পরিচয়টিকে সে ভালবাসে, যক্ষপুরীর অধিবাসীরাও তাহার এই পরিচয়টিকে শ্রদ্ধা করে। তাহারাই তাহাকে আদর করিয়া এই উপাধি দিয়াছে। এই নামটি ধরিয়া তাহাকে ডাকিলে মকররাজ ভারি খুশি হয়। সেই খুশির আবেশে তাহার কঠিন মুখের উপর কেমন একটা হাসির আভাস খেলিয়া যায়। সে হাসিটি আমরা দেখি নাই; কিন্তু কল্পনা করিয়া লইতে পারি। তাহার শক্ত দৃঢ় চোয়ালের ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলি সেই হাসির আবেগে যেন নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসে, আর তাহার কালো দুই ভুরু চোখের উপর গোল হইয়া বাঁকিয়া যায়। বলিতে পারি না, যক্ষপুরীর সর্দার বোধ হয় রাজার এই হাসি দেখিয়াছে।

এই সাদা হাসির আড়ালে, কঠিন মুখের পিছনে, বাঁকা ভুরুর শাসনে মকররাজের ভালো নামটি হারাইয়া গিয়াছে।

সেই নামটি ধরিয়া যক্ষপুরীতে যদি মকররাজকে কেহ ডাকিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয় খুশি হইত না। কারণ মকররাজ আপনার যে পরিচয়ে গর্বিত, সেই নামটির মধ্যে সেই পরিচয়টির ঘোষণা নাই। যক্ষপুরীর অধিবাসীরা রাজার সেই হারাইয়া যাওয়া নামটি লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহারা 'মকররাজ' এই নামটিকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

কিন্তু নন্দিনী বলিয়া একটি মেয়ে আসিয়া রাজার এই মকররাজ নামটি স্বীকার করিতে চাহিল না। সে রাজার সেই হারাইয়া যাওয়া নামটি ধরিয়া ডাকিতে চাহিল। স্পষ্ট করিয়া ডাকিতে পারিল না, কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে রাজাকে সেই নামটি স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল।

আমরা জানিলাম, রাজার এই হারাইয়া যাওয়া নামটি হইল—রঞ্জন।

জালের পর্দার ভিতর হইতে নন্দিনীকে মকররাজ জিজ্ঞাসা করিল—

—আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে করো খুলে বলো তো!

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো—দেখে আমার মন নাচে।

রাজা। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন-যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে-নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

—নন্দিনীকে দেখিয়া রাজার আপনা হইতেই রঞ্জনের কথা মনে হইয়াছে। রাজাকে রঞ্জনের কথা মনে করাইয়া দেওয়াই 'রক্তকরবী' নাটকের নাট্য-বস্তুর স্থচনা।

এই ঘটনার প্রকৃতিটিকে বুঝিয়া দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ এখানে একটি নূতন শিল্প-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—"আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্লায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"

এইভাবে কবি একই ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে দুইটি বিরোধী চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। দুইটি বিরোধী 'ভাব' না বলিয়া 'চরিত্র' বলিলাম এই জন্য যে ভাব দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কর্মের মধ্য দিয়া প্রকাশমান বলিয়া দুইটি ভিন্ন চরিত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। অথচ দুইটি পৃথক্ ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হয় নাই কারণ ইহারা একই ব্যক্তিসত্তার দুই বিভিন্ন প্রকাশ। [রঞ্জনের ক্রিয়াকলাপ নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে উল্লেখের দ্বারা জানানো হইয়াছে, তাহার কর্মের কোন বাস্তব ঘটনার সৃষ্টি করা হয় নাই বা অভিনয়ের সাহায্যে দেখানো হয় নাই] রঞ্জন ও মকররাজ একই ব্যক্তি। রঞ্জন কোন ভাবসত্তা মাত্র নহে, কোন তত্ত্ব বা রূপকও নহে। রঞ্জন যক্ষরাজের পূর্ব জীবনের পরিচয়। যক্ষরাজই এক সময়ে তাহার পল্লীজীবনে রঞ্জন নামে পরিচিত ছিল। যন্ত্র-সভ্যতায়

শক্তির সাধনা করিয়া সে আজ মকররাজ এই নামে পরিচিত হইতেছে। সে এক সময় রঞ্জন ছিল বলিয়াই রঞ্জন নামটিকে তাহার মনে পড়িয়াছে। নতুবা রাজার পক্ষে রঞ্জনকে জানিবার কোনও উপায় নাই। আর মকররাজ ও রঞ্জন দুই ব্যক্তি নহে, কারণ নন্দিনী দ্বিচারিণী নহে। তবে রঞ্জন মকররাজ হইয়া উঠায় নন্দিনীর প্রেমের মধ্যে একটি দ্বিধার ভাব আসিয়া গিয়াছে। [নন্দিনীর প্রেমের বিশ্লেষণে যথাস্থানে ইহার পরিচয় দেওয়া যাইবে।] আবার নন্দিনী যখন 'আমার রঞ্জন' বলিয়া বিশেষভাবে রঞ্জনের কথা উল্লেখ করে, অথচ রঞ্জনকে ব্যক্তি হিসাবে নাটকে দেখিতে পাই না তখন স্বতঃই রঞ্জনকে একটি ভাব-প্রতীক বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু নাট্য-বস্তুর দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই ভ্রমটি দূর হইবে। মকররাজ আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানে তাহার পূর্ব পরিচয়—রঞ্জনের পরিচয়, লাভ করিবে, ইহাই নাটকের নাট্যবস্তু। 'রঞ্জন' এই নামটির দ্বারা রাজার সেই পরিচয়টিকে জানানো হইয়াছে। নন্দিনী যখন 'আমার রঞ্জন' বলিয়া উল্লেখ করে তখন রাজার সেই পরিচয়টিকেই ঘোষণা করে। কিন্তু সেই পরিচয়টি কোন ব্যক্তি-সত্তার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে না, কারণ রাজা এখন 'মকররাজ' হইয়া আছে। রাজার এই অধুনা অপ্রকাশিত পরিচয়টিকে নাট্যকার যখন পাত্রপাত্রীর মুখে উল্লেখের সাহায্যে আমাদের নিকট উপস্থিত করিতে চাহিতেছেন তখন আমাদের তত্ত্বানুসন্ধানী মনের কাছে তাহা সহজেই রূপক বা ভাব-প্রতীক বলিয়া মনে হইতেছে এবং নাট্যকারও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পড়িয়া যাইতেছেন। যাহা হউক অবশেষে কবিকে নানাভাবে কৈফিয়ৎ দিয়া ঋণ শোধ করিতে হইয়াছে।

এইভাবে একই দেহে দুইটি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া কবি নাট্য-বস্তুকে অন্তর্নাট্যের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার আপনার সহিত আপনার দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এবং সমস্ত বিষয়টি রাজার মনোজীবনের নাটক হইয়া উঠিতেছে। রাজা যক্ষপুরীতে মকররাজ হইয়া আছে; নন্দিনীর আহ্বানে এই মকররাজ সাড়া দিতে চাহে না, তাহার সময় নাই। কিন্তু নন্দিনীর গান শুনিলে, তাহার খুশি দেখিলে, সেই মকররাজটার মরিতে ইচ্ছা করে—তাহার মধ্যে তাহার পূর্বের পরিচয়—রঞ্জন জাগিয়া উঠিতে চায়। রঞ্জন জাগিয়া উঠিতে পারে না কিন্তু মকররাজের সব সময় রঞ্জনের কথা মনে পড়িতে থাকে। অতএব এই ঘটনাটি একটি মানসিক ঘটনা। রাজার মনের মধ্যে এই দুইটি চরিত্রের দ্বন্দ্ব সুরু হয়—রাজা আপনার সহিত আপনি বিবাদ করিতে থাকে।

এই যে আপনার পূর্ব পরিচয়ের প্রতি মকররাজের সচেতনতা ইহা মকর-রাজের মনোজীবনের ঘটনা বলিয়া ইহার পিছনে একটি বিশেষ মানসিক বিপর্যয় রহিয়াছে। এই মানসিক বিপর্যয়টিই মকররাজের সকল প্রকার কাঠিন্যের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। আমাদের জীবন যখন প্রেমের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে আপনার সার্থকতা অবলম্বন করিতে যায়, তখন প্রেমের অভাব হইতে তাহার মধ্যে একটি মানসিক বিপর্যয় সাধিত হয়—মনোজীবনের এমনই একটি তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। মকররাজের জীবনে এই মানসিক বিপর্যয়টি নন্দিনীর সহিত কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে।

নন্দিনী। তুমি যে এত ক্লান্ত, তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

রাজা। নন্দিনী, একদিন দূর দেশে আমারই মতো একটি ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম।"

এই যে ভিতরে ভিতরে ব্যথাইয়া উঠা, ইহাই মানসিক বিপর্যয়। এই বেদনার রাসায়নিক ক্রিয়াতে মকররাজের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। নন্দিনীর গান শুনিয়া মকররাজের আপনার পূর্বজীবনের কথা, তথা রঞ্জনের কথা মনে পড়িয়াছে।

আমাদের জীবন-সাধনার মধ্যে এমন কোন একটি মানসিক বিপর্যয়কে হয়তো অনেকে স্বীকার করিতে চাহিবেন না অথবা কোন একটি বিরাট পরিবর্তন-সাধনের পক্ষে ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করিবেন। কিন্তু এই মানসিক বিপর্যয় আমাদের জীবনে নিতান্ত সত্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। কাহারও জীবনে যদি সে বিপর্যয় না আসে তবে ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, এই ধরণের মানসিক বিপর্যয় বলিয়া কিছু নাই, পরন্তু এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে সেই মানসিক বিপর্যয় ঘটিবার উপযুক্ত অবসর সেই জীবনে তখনও আসে নাই বা তাহার পরিবেশ তখনও রচিত হয় নাই।

তাহা হইলে আমাদের জীবনে এই মানসিক বিপর্যয়ের অবকাশ কোথায়, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ?

আমাদের জীবন নিত্য নূতন প্রাপ্তির মধ্য দিয়া নিত্য নূতন প্রাপ্তির দিকে ছুটিয়া চলে। সাধারণতঃ এই প্রাপ্তির স্বরূপ হইল বস্তু-ভোগ। এই বস্তুভোগের দ্বারা আমাদের বস্তুভোগ-বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, চিত্ত কেবলই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইতে থাকে। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই এই সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠে যে ভোগের দ্বারা কখনও ভোগের শেষ পাওয়া যায় না। এই সত্যটিকে আমরা সাধারণতঃ স্বীকার করিতে চাহি না দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে আমাদের জীবনে ভোগের অবকাশ অল্প যাহার জন্য বস্তু-ভোগ আমাদের নিকট এত কাম্য হইয়া দাঁড়ায় যে তাহাকে বাদ দিয়া অন্য কথা আমরা ভাবিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জীবনই হইল ক্ষণস্থায়ী। জীবনের মধ্যে কোন ক্রমে যদিও বা ভোগের আয়োজন কিছুটা সম্পূর্ণ করা গেল, তখন হয়তো দেখা গেল যে আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই অন্তরে অতৃপ্ত ভোগ-কামনা থাকার জন্য ভোগের অতীতে আমরা কিছু ভাবিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন ভোগের মধ্যে ভোগের শেষ নাই। এ প্রসঙ্গে মহাভারতে রাজা যযাতির উপাখ্যানটি স্মরণীয়। আপনার পুত্রের যৌবনের অধিকারী হইয়া দীর্ঘ জীবনের ভোগের ভূমিকায় রাজা যযাতি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইল এই—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

—কাম্য-বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃত সংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য যত হিরণ্য পশু ও স্ত্রী আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, অতএব বিষয়-তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত" (মহাভারত—রাজশেখর বসু—পৃঃ ৩৪)।

অবশ্য এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার জন্য আশাতীত দীর্ঘ জীবন এবং তদনুযায়ী প্রচুর ভোগ-বস্তুর প্রয়োজন। জীবনের কোন এক ক্ষণে কোন এক বিশেষ ভোগের অভিজ্ঞতা হইতেই এই সত্যকে লাভ করা যায়। আসল কথা হইল ভোগের মধ্যে প্রাপ্তির শেষ নাই—

এ সত্য আমাদের জীবনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা তাহাকে বুঝিতে পারি না।

আমাদের জীবনে এই অভিজ্ঞতা একটি মানসিক বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকে। যখন ভোগের বিষয় হইতে আমাদের মধ্যে একটা অপ্রাপ্তির বোধ জাগে, তখন অবলম্বন'শূন্য হইয়া জীবন একটা শূন্যতার মধ্যে থাকে। এই শূন্যতার বোধ নূতন কোন একটা বিষয়কে লাভ করিবার জন্য মনের মধ্যে বাসনা জাগাইয়া তোলে। এই যে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে চিত্তের অপসরণ, ইহার ক্রিয়াটি মানসিক। এই মানসিক বিপর্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বিষয়ান্তরে লিপ্ত হইয়া থাকি। সে বিষয় বস্তুগত হইতে পারে, আত্মগতও হইতে পারে। যখন বস্তুগত বিষয়ে লিপ্ত হই, জীবন তখন এক জটিলতা হইতে অন্য জটিলতার মধ্যে, এক বিকৃতি হইতে অন্য বিকৃতির মধ্যে, এক অতৃপ্তি হইতে অন্য অতৃপ্তির মধ্যে প্রবেশ করে। আর বিষয়টি যদি আধ্যাত্মিক হয় তাহা হইলে জীবনের একপ্রকার মুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এখানে পাওয়ার আর একটি রূপ আছে যাহাতে পাওয়ার বিষয়কে চরম করিয়া লাভ করিয়াও তাহা হইতে অপ্রাপ্তির বোধ জাগে না। এ প্রসঙ্গে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'পাওয়া' শীর্ষক আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।·········(কিন্তু) প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই, জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে, কিন্তু, পঞ্চত্ব লাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরও গভীর রূপে জাগ্রত হয়।······মানুষের মধ্যে যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না।"

যক্ষপুরীর রাজার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমনই একটি মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত করিতে চাহিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে যক্ষপুরীর চিকিৎসক ও সর্দারের কথোপকথন এইরূপ—

চিকিৎসক। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার। এর প্রতিকার কী।

চিকিৎসক। বড়ো রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার। অর্থাৎ আর কারো ক্ষতি করতে না দিলে উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক। ওরা বড়োলোক, বড়ো শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আর একটি খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে।

যক্ষপুরীর চিকিৎসক তাহার উপযুক্ত বিধান দিয়াছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজার মধ্যে এই মানসিক বিপর্যয়টি সৃষ্টি করিয়া রাজার জীবনের মোড়টি প্রেমের পথে ঘুরাইয়া দিয়াছেন, রাজার মধ্যে রঞ্জনের প্রতি সচেতনতা জাগাইয়া তুলিয়াছেন।

নন্দিনী আসিয়া রাজাকে বলিল, রাজা, কুঁদফুলের মালা এনেছি, গলায় পরো।

কুঁদফুলের মালা গলায় পরা—এই বিষয়টিই একটি মানসিক ভোগ। রাজার যে জীবন, সেখানে এই মানসিক ভোগের স্থান নাই। মনোজীবনের এমনই একটি ভোগের বিষয় নন্দিনীর মারফৎ রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভোগটিতে রাজা অভ্যস্থ নয়, ইহাকে উপেক্ষা করিয়া রাজা আপনার দম্ভ প্রকাশ করিয়া তৃপ্ত। 'ফুলের মালা গলায় পরিয়া লাভ কি'—রাজার মনের ভাবটি এইরূপ। বিষয়টির মধ্য হইতে রাজা কোন রস পায় না।

এই যেমন একটি ভাব-জীবনের কথা নন্দিনী বলিয়াছে, তেমনি একটি কর্ম-জীবনের কথাও নন্দিনী রাজাকে বলিল। নন্দিনী বলিল,—রাজা, তুমি বেরিয়ে এসো, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

রাজা তো কথাটি বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। যে সোনার পর সোনা জমাইয়া (ফ্যাক্টরির পর ফ্যাক্টরি তৈয়ারী করিয়া) শক্তির সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে, সে কিনা মাঠে গিয়া ধানের চাষ করিবে!

ধানের ক্ষেতের মধ্যে আছে কর্মের সহজ রূপ, কুন্দফুলের মালায় আছে শুভ্র সৌন্দর্যের রূপ। রাজার কাছে নন্দিনী এই দু'য়ের আহ্বান আনিয়াছে। এই দুই আহ্বানকেই রাজা অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু যে এই আহ্বান

আনিয়াছে তাহাকে রাজা অস্বীকার করিতে পারে না। রাজার মনোজীবনে তাহার জন্য একটা চাহিদা রহিয়াছে।

এই চাহিদাটিকে অনুসন্ধান করিলে দেখি, তাহার বীজ রহিয়াছে রাজার পূর্ব পরিচয়ের মধ্যে। রাজা যখন রঞ্জন হইয়া ছিল, তখন এই চাহিদা রাজার যৌবনের রঙ্গীন বাসনা হইয়া ছিল। এখন রাজা মকররাজ হইয়া উঠাতে সেই বাসনার প্রকৃতিটি বদলাইয়া যাইলেও বাসনাটি রহিয়া গিয়াছে। এখন রাজা বলে—"নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙ্গে চুরে ফেলতে চাই।"

নন্দিনীর এই অপরূপতাকে স্বীকার করিতে না পারিয়া রাজার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রেমের মাধ্যমে নন্দিনীর এই অপরূপতাকে বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেও ভোগ করিতে পারা যায়, রাজা সেই প্রেমের পথ হইতে বিচ্যুত। ফলে নন্দিনী রাজার আয়ত্তের মধ্যে থাকিলেও, নন্দিনীকে রাজা লাভ করিতে পারিতেছে না। নন্দিনী তো ধরা দিতেই চায়, কিন্তু রাজা ধরিতে পারিতেছে না।

এই ভাবে দেখি, রাজার মধ্যে যে একটি দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে রাজার মনোজীবনের বিষয়। "তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে"—ইহাই হইল রাজার ক্ষোভের কথা। এই ক্ষোভটিতে রাজা নিজের মধ্যে আঁকুপাঁকু করিতে থাকে, মাঝে মাঝে হাত পাকাইয়া বলে, "বিধাতার বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে", মাঝে মাঝে আবার কি মনে হয়, নন্দিনীর একটুখানি স্পর্শ লাভ করিতে সাধ যায়, হাতের মধ্যে নন্দিনীর হাতখানি রাখিতে চায়। আবার নন্দিনী যখন আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে যে রঞ্জনের কাছেই সে আপনাকে সমর্পণ করিবে, তখন রাজা ক্ষোভে ঈর্ষায় গর্জন করিয়া ওঠে।

এমনি ভাবে রাজার মনের মধ্যে নন্দিনীকে লইয়া একটা তোলপাড় চলিতে থাকে। এই মানসিক বিক্ষোভের শক্তি যে কতখানি তাহা বাহির হইতে জানিবার উপায় নাই। মনস্তত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় নিয়মে ইহা যে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়, বাহির হইতে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায়

না। ব্যক্তি নিজেও বুঝিতে পারে না যে আপাতঃদৃষ্টিতে যাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, যে-বিরোধকে সে এক প্রকার ভুলিয়া ছিল, তাহা কেমন করিয়া তাহার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। বস্তু-জগতের কোন একটি বিরাট পরিবর্তনের জন্য বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন। একটা সামান্য পাথরের ঢিবিকে সরাইতে গেলে কত টানাটানি, ছেঁড়া-ছিঁড়ি; কত দড়ি-দড়ার বাঁধন, কত লোকজনের ঠেলাঠেলি। কিন্তু আমাদের মনো-জগতের একটি বিরাট পরিবর্তনের কারণ অনেক সময় এত ক্ষুদ্র হইয়া দেখা দেয় যে বাহির হইতে তাহাকে চিনিতেই পারা যায় না। তাহার শক্তি শুধু তাহার ধর্মের বৈপরীত্যে। এই শক্তির প্রকাশের প্রকৃতিও ভিন্ন। তেজস্ক্রিয় (Radio-active) পদার্থের সহিত ইহার আচরণের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেডিয়ামের কণা আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা যেমন আপনার মধ্য হইতে অদৃশ্য-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া দেহের সৌধকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, বাহির হইতে দেখিলে যে ভাঙ্গনের কারণকে কিছুতেই পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না, তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও অনেক সময় সূক্ষ্মাকারে এমন একটি বিপরীতধর্মীভাব আসিয়া প্রবেশ করে যাহা আপনার অদৃশ্য তেজ বিকীর্ণ করিয়া মনের স্থায়ী ধর্মকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, বাহির হইতে যে-ক্রিয়ার রহস্য ও সম্ভাবনাকে বুঝিয়া উঠা যায় না। রাজার মনের মধ্যেও দ্বন্দ্বের ক্রিয়াটি এইরূপ। সেখানে রাজার মধ্যে যে বিপরীত ভাবটি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা বাহিরের কোন শক্তির প্রতীক্ষায় না থাকিয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থের ন্যায় আপনার শক্তি আপনি বিকীর্ণ করিতেছে। সাধারণতঃ আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিকাশের জন্য বাহিরের বহু প্রত্যক্ষ ঘটনার অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বটি বাহিরের বিশেষ কোন ঘটনার অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনাআপনি বিকাশ লাভ করিতেছে।

তাই রাজার মধ্যে নিঃশব্দে একটি পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে। এই পরিবর্তনটির ধারাবাহিকতাকে রাজার কতকগুলি মানসিক অবস্থা-পরম্পরা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

নন্দিনীকে নিজের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করে,—আমাকে ভয় করে না? রাজার সম্বন্ধে কাহারও কোন মনোভাবকে যদি রাজাকে স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহা এই ভয়ের মনোভাব। রাজা চায় সকলে তাহাকে ভয় করিবে, তাহা হইলেই রাজা বুঝিতে পারে যে তাহার সহিত সম্বন্ধটি ঠিক ঠিক

চলিতেছে। এই জিজ্ঞাসার মধ্যে রাজার একটি মানসিক অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। নন্দিনী প্রেমের সম্বন্ধে রাজার মধ্যে রঞ্জনকে আহ্বান করিয়াছিল, এই ভয়ের সম্বন্ধে রাজা মকররাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। রাজা নন্দিনীকে মকররাজকে চিনাইয়া দিতে চায়। রাজার এই জিজ্ঞাসাটি তাহার পূর্বেকার মানসিক অবস্থারই বিকাশ। বিষয়টিকে বুঝিয়া দেখা যাক।

নন্দিনী আসিয়া যখন রাজাকে বলিল যে, রঞ্জনকে দেখিয়া তাহার মন-যে নাচে, সে নাচের তাল আলাদা, তখন রঞ্জনের কাছে মকররাজের হার হইয়া গেল। মকররাজের আছে শক্তি, রঞ্জনের আছে যৌবন। শক্তি জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু যৌবন ছাড়িয়া দিয়াই বাঁধিয়া রাখে। তাহাতে যাহাকে ভালবাসি সেও যে সমভাবে ভালবাসিয়া বন্ধন স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু শক্তির দ্বারা তেমন করিয়া ভালবাসাইতে পারি না, বাঁধিতে পারি, কিন্তু বন্ধন স্বীকার করাইতে পারি না। শক্তির পরিচয় পাইয়া নন্দিনী খুশি হয় মাত্র, কিন্তু তাহার কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিতে পারে না। তাই রঞ্জনের কাছে মকররাজের হার হইয়া গিয়াছে। মকররাজের অন্তরে একটি দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি হয়,—'হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না!' কিন্তু যে-অভ্রভেদী শক্তির সৌধ সে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারই গরিমায় হার সে কিছুতেই মানিবে না। তাই সে পরক্ষণেই বলিয়া উঠে,—বিধাতার বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে। তাই সে নন্দিনীকে আপনার পরিচয়টি জানাইতে চায়। নন্দিনী রঞ্জনকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে, রাজা তাই মকররাজের পরিচয়টি উপস্থিত করিতে চায়।

রাজার মনোজীবনে দুইটি বিষয় দেখা দিয়াছে। এক হইল, রঞ্জনের প্রতি নন্দিনীর আকর্ষণকে জানা; আর হইল সেই রঞ্জনকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া মকররাজের পরিচয় দান করা। নন্দিনীকে তাই জিজ্ঞাসা করে,—'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি রকম ভালবাস।' জিজ্ঞাসা করে,—'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার? নন্দিনী যতই রঞ্জনকে ঘোষণা করে, রাজা ততই নিরুপায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, ততই রঞ্জনকে তুচ্ছ করিয়া মকররাজকে ঘোষণা করিবার বাসনা জাগে।

ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে, রাজার মনোজীবনের দ্বন্দ্বের বিষয়টি বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ ঘটনার সৃষ্টি করিতেছে না। ইহারা কতকগুলি মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে। রাজার মুখের কথা হইতে সেই মানসিক

অবস্থাগুলিকে জানিতে পারা যায়। কিন্তু মধ্যে একটি ছোট ঘটনাও আছে,—নন্দিনীকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া রাজা যখন নন্দিনীর খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘটনাটি সামান্যই, কিন্তু ইহার মধ্যে রাজার মনোবিকাশের একটি গভীর পরিচয় রহিয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে তাহাকে সহজে বুঝা যায় না। রাজা নিজেই ইহার পরিচয় দিয়াছে। —"আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনও এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।"

এখন জালের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে সেগুলি সাধারণতঃ রাজার মনো-জীবনের ঘটনা। জালটি হইতেছে রাজার নৃপতিত্বের পরিচায়ক। জালের মধ্যে রাজার যে-রূপ তাহা প্রত্যক্ষ নয়। জালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নন্দিনী রাজার যে-রূপ দেখিয়াছে, তাহা নন্দিনীর কাছেই প্রকাশ পাইয়াছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। তাই জালের মধ্যে এই যে ঘটনাটি ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা হইলেও সকলের কাছে তাহা প্রত্যক্ষ নয়। যক্ষপুরীর অধিবাসীরা ভাবিতেও পারে না যে রাজার মনোবিকাশের ফলে রাজার নিকট হইতে এমনই একটি ঘটনার সৃষ্টি হইতে পারে। রাজার এই আচরণটি এখনও সকলের নিকট প্রকাশ পায় নাই। এইরূপ ঘটনা সকলের কাছে তখনই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে যখন রাজা এই নৃপতিত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়া সকলের কাছে আত্মপ্রকাশ করিবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বুঝিয়া দেখা যাক। প্রশ্ন জাগিতে পারে, রাজার তো দুইটি পরিচয়,—রঞ্জন ও মকররাজ। জালের বাহির হইতে মকররাজের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে জালের ভিতরে গিয়া নন্দিনী রঞ্জনকে দেখিতে পাইল না কেন?

রঞ্জন আজ রাজা হইয়া উঠিয়াছে। এই রাজার নাম মকররাজ। এই মকররাজ পরিচয়টির প্রভাবে রঞ্জন আজ অবলুপ্ত। জালটি হইল মকররাজের নৃপতিত্বের পরিচায়ক। জালটির বাধা দূর হইলে মকররাজের বিকৃতিগুলি দূর হইবে, কিন্তু তাহাতেই মকররাজ রঞ্জন হইয়া উঠিবে না। রঞ্জন হইয়া উঠিবার জন্য তাহাকে তখন আবার রঞ্জনের জীবন-সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে। জালের ভিতরে গিয়া নন্দিনী মকররাজের শক্তির রূপকেই দেখিয়াছে সেই

শক্তি-রূপের মধ্যে রঞ্জনের পরিচয়টি নাই। রঞ্জন বিশেষ জীবন-সাধনার দ্বারা এই রূপটি অর্জন করিয়াছে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে, মকররাজ রঞ্জনের বিপরীত বিকাশ নয়, বিকৃত বিকাশ। শক্তির সাধনায় রঞ্জনই যৌবনকে হত্যা করিয়া মকররাজ হইয়া উঠিয়াছে। জালের মধ্যে মকররাজের সেই শক্তির রূপটি চোখে পড়ে, জালের বাহির হইতে দেখা যায় তাহার বিকৃতিটি।

এই বিকৃতিকে দূরে সরাইয়া মকররাজ যখন নন্দিনীকে আপনার গণ্ডীর মধ্যে আহ্বান করে, সেই সময়টি মকররাজের পক্ষে বড় দুর্বল মুহূর্ত। তখনই নন্দিনীর প্রভাব তাহাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। তখনই নন্দিনীর গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া তাহার ঘুমাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু নন্দিনী পণ করিয়া বসিয়াছে, রঞ্জন না হইলে আত্মসমর্পণ করিবে না। নন্দিনীর প্রেমের কথা মকররাজ এখন লোভীর মতন শুনিতে চায়। কিন্তু তাই বলিয়া মকররাজ তো আর তাহার এতদিনের ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়া রঞ্জন হইয়া উঠিতে পারে না। নন্দিনীকে তাই সে জালের পর্দার বাহিরে সরাইয়া দেয়।

কিন্তু নন্দিনী দূরে থাকিতে চায় না, জালের পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়। রাজা নন্দিনীর কথা রাখে না, কিন্তু সে যে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রাজার ইচ্ছা এখন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। নন্দিনীর অলকে রক্তকরবীর গুচ্ছ দেখিয়া রাজা বলে—"ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারি রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধ'রে এসেছে। কখনো ইচ্ছে ক'রছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরি আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তাহলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।"

নন্দিনী বলে, রঞ্জনের জন্য সে অপেক্ষা করিয়া আছে।

রাজা বলে, রঞ্জনকে সে ধুলোর সঙ্গে মিলাইয়া দিবে যাহাতে তাহাকে একেবারে না চেনা যায়।

রাজার শক্তির দম্ভ নন্দিনীকে উপহাস করে; রাজা আপনার শক্তির কথা প্রচার করিয়া আস্ফালন করিতে থাকে, কিন্তু নন্দিনীর প্রেমের সহজ অথচ দৃঢ় প্রতিবাদে সে আস্ফালনও তুচ্ছ হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে দেখি, রাজার মানসিক অবস্থাটি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে;—

নন্দিনীর প্রেমের প্রতি-রাজার লোভ জাগিয়াছে, রঞ্জনকে সেই প্রেমের পাত্র জানিয়া রঞ্জনের প্রতি নিদারুণ ঈর্ষা ও ক্রোধ জাগিয়াছে এবং নিজে রঞ্জন হইয়া না উঠিলে নন্দিনীকে লাভ করিতে পারিবে না, এ কথা বুঝিয়া একটা পরাজয়ের গ্লানি জাগিয়াছে। এই পরাজয়ের বোধ হইতে রাজার মাঝে মাঝে নন্দিনীকে পর্যন্ত জীবন হইতে অবলুপ্ত করিয়া দিবার বাসনা হয়, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নন্দিনী-বিহীন করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু পারে না, নন্দিনীকে আবার ফিরিয়া ডাকে; জীবন হইতে প্রেমকে সমূলে উৎপাটিত করিতে গিয়াও রাজার হাত উঠে না। রঞ্জনকে রাজা অস্বীকার করিতে পারে একটি বিকৃত জীবনের মোহে, কিন্তু নন্দিনীকে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া। সে যে নিতান্ত সত্য হইয়া আছে। তাহার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তাহার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা! জীবন হইতে ইহাকে রাজা মুছিয়া ফেলিবে কেমন করিয়া?

রাজার মন তাই শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এই অবসাদকে দূর করিতে রাজা ধ্বজা-পূজার আয়োজন করিল, অর্থাৎ শক্তির সাধনাকে আরও গভীর করিয়া লইতে চাহিল।

তাহার প্রেম লইয়া নন্দিনী দাঁড়াইল পথ রুধিয়া। দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আপনার পরিচয় দিতে রাজা বাহির হইয়া আসিল।

রাজাকে বাহিরে দেখিয়াই নন্দিনী বুঝিতে পারিল, রঞ্জন মরিয়া গিয়াছে। নন্দিনীর কথায় রাজাও বুঝিতে পারিল, এতদিন ধরিয়া সে নিজেই তাহার যৌবনকে মারিয়া আসিয়াছে।

রাজার এই বোধটিই তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশের পরিপূর্ণতা।

রাজা আগে বুঝিয়াছিল যে, তাহার যৌবন-শক্তি নাই, এখন রাজা বুঝিয়াছে যে, সেই যৌবনকে সে যক্ষপুরীর বিধান অনুযায়ী নিজেই হত্যা করিয়া আসিয়াছে। এই বিষয়টিকে রাজা ভুলিয়াছিল, কিন্তু নন্দিনীর ভালবাসা চাহিতে গিয়া এই কথাটি রাজার মনে জাগিয়াছে। জালের পর্দার বাহিরে আসিয়া তখন রাজা নন্দিনীকে বলিল,—আমার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে চলো, কিন্তু আমারই হাতে হাত রাখিয়া। কথাটির অর্থ আমরা এখন বুঝিতে পারি। রাজা জালের আবরণের বাহিরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু রঞ্জন আজ মৃত। রাজা আবার রঞ্জন হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার জন্য এই মকররাজকে মরিতে হইবে, রঞ্জনের জীবন-সাধনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই মকররাজকে

মারিবে কে? মারিবে নন্দিনীর প্রেম। রাজা তাই বলিল,—"আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।"

এইরূপে আমরা দেখিলাম, যাহা জাতিগতভাবে দুই পৃথক জীবন-সাধনার দ্বন্দ্বের বিষয়, রাজার মধ্যে রঞ্জন ও মকররাজ, এই দুই পরিচয়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়াছেন। এই দুই সাধনাকে একই ব্যক্তির দুইটি বিভিন্ন জীবন-সাধনা করিয়া তুলিয়াছেন এবং প্রেমের ভূমিকায় এক সাধনা হইতে অপর সাধনায় জীবনের মোড়টি ঘুরাইয়া দিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহারই জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ নারী-প্রেমের একটি রমণীয় পটভূমি এবং ব্যক্তি-জীবনের একটি অভিনব অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই দ্বন্দ্বটিকে আমরা যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলাম, অতঃপর নারী-প্রেমের সেই রমণীয় পটভূমিটির পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়

নন্দিনী—মানবী ও রক্তকরবী

যক্ষপুরীর রাজার কথা বলিলাম ; যে নারী-প্রেম এই রাজাকে যক্ষপুরীর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল, আমরা অতঃপর সেই নারী-প্রেমের কথা বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে একটি কথা বলিতে চাই। নাটকে আমরা নন্দিনীকে যে ভাবে দেখি, তাহাতে সুধীগণ অনেকেই নন্দিনীকে অ-মানবী বলিয়া মনে করেন। ইহারই জন্য হয়তো তাহার মধ্যে মানবিক দ্বন্দ্বের অনুসন্ধান না করিয়া তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন ; জীবনের চিত্রকে না দেখিয়া প্রতীককে দেখেন। আমরা যদি শুরুতেই নন্দিনীকে প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে তাহার মধ্যে মানবী-প্রেমের দ্বন্দ্বের রূপটি বুঝিতে পারিব না, প্রতিপদে আমাদের প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে, ইহা আমাদের রসাস্বাদনের বিষয় হইয়া উঠিবে না। আমরা তাই প্রথমে মানবী ও অ-মানবীর দ্বন্দ্বটি নিরসন করিয়া লইব। তাহার পর নন্দিনীর প্রেমের রূপটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব যে, ইহার মধ্যে মানবীরই সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব খেলা করিতেছে।

নারী যখন পুরুষের মনে বাসনা জাগায়, প্রেম জাগায়, তখন সেই প্রেম-মানসের প্রকৃতি অনুযায়ী নারী পুরুষের কাছে একটি বিশেষ রূপ লাভ করে। সে তখন আর শুধু মাত্র বাহিরের ব্যক্তি হইয়াই থাকে না, সে তখন মানসী হইয়া দাঁড়ায়। পুরুষের প্রেম তাহাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে। চৈতালি কাব্যে 'মানসী' শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি, নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।......
... ...
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা॥"

এইরূপে পুরুষের বাসনার বিকারে মানবী নারী একটি অ-মানবীর রূপ লাভ করে। কিন্তু সেই রূপটিই তাহার প্রকৃত রূপ নয়। তাহার যেটি

প্রকৃত রূপ তাহার মধ্যে হয়তো অনেক অপূর্ণতা আছে, তুচ্ছতা আছে, স্থূলতা আছে। প্রেম কিন্তু আপনার ধর্ম-বৈশিষ্ট্যে নারীর মধ্যে কতকগুলি ধর্মকে প্রধান করিয়া তোলে। তাহাতে হয়তো কতকগুলি উপাদান নারীর বাস্তব-রূপ হইতে বাছিয়া লয়, আর, যেগুলি কম পড়ে সেগুলি আপনার কল্পনা দিয়া পূরণ করিয়া লয়। এইরূপে প্রেমিকের কাছে তাহার মানসী অনন্যা হইয়া উঠে। শেষের কবিতায় অমিত রায়ের মত সে বলে,—

"হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

কিন্তু বাস্তবে হয়তো সে এতখানি অনন্যা নয়।

এদিকে "কুমার মুখো"র দল আছে, "লিসি-সিসি"র মহল আছে, সেখান হইতেও নারীকে আর একভাবে দেখা যায়। তখন আবার অমিতের "অনন্যা" সামান্য একজন মাস্টারনী হইয়া দাঁড়ায়। "অনন্যা"ও আংশিক সত্য, "মাস্টারনী'ও আংশিক সত্য, লাবণ্যের পরিচয় "লাবণ্যের" মধ্যেই রহিয়াছে, রহিয়াছে তাহার আপন সুখ-দুঃখের মধ্যে, আপনার জীবন-দ্বন্দ্বের মধ্যে।

'রক্তকরবী' নাটকে দেখি, মানবী নন্দিনী যক্ষপুরীতে বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ বা তাহাকে ছোট করিয়া দেখিয়াছে, কেহ বা তাহাকে অসাধারণ রূপে দেখিয়াছে। নারী তাহার মাধুর্যের দ্বারা পুরুষের মধ্যে যে প্রেমের প্রবর্তনা আনিয়া দেয়, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহা বিভিন্ন রূপ লাভ করে। নারী নিজেই হয়তো পুরুষের মধ্যে প্রেমের এই বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। সে হয়তো বুঝিতেই পারে না যে, তাহার পাশে যে পুরুষটি রহিয়াছে, তাহাকে সে কী ভাবে নাড়া দিয়াছে। নন্দিনীও সেইরূপ বুঝিতে পারে না, কিশোর তাহাকে এত করিয়া ডাকে কেন, তাহাকে দেখিয়া অধ্যাপকের এত বিস্ময় কিসের, বিশু তাহাকে 'দুখ-জাগানিয়া'ই বা বলিতেছে কেন। [কিন্তু রঞ্জনের রক্তকরবী ডাকটি সে একরকম করিয়া বুঝিতে পারিত। ইহার কথা পরে বলা যাইবে।] আবার চন্দ্রা, গোকুল, ফাগুলাল,—ইহারাও তাহাকে আর একভাবে দেখিতেছে। এই বিভিন্ন দেখার মধ্য দিয়া নন্দিনীর বিভিন্ন পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার মধ্যে কোন্‌টি নন্দিনীর সত্য পরিচয়, কোন্‌টিতে আমরা মানবী নন্দিনীকে চিনিয়া লইতে

পারি? এই পরিচয় পাওয়া যায় নন্দিনীর মানবীয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে, তাহার সুখ-দুঃখ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে।

রক্তকরবী নাটকে কিশোর, অধ্যাপক, বিশু—ইহাদের কথাবার্তায় নন্দিনীর যে পরিচয়টি আমরা পাই, তাহার দ্বারা আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। নন্দিনী তাহাদের মধ্যে যে প্রেমের আবেশটি সৃষ্টি করে, তাহাকে কবি রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই চিত্রগুলির কাব্যত্ব আমাদের রসিক মনকে সহজেই আবিষ্ট করিয়া দেয়, ফলে এই চিত্রগুলির দ্বারাই আমরা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়া পড়ি এবং ইহার মধ্য দিয়া নন্দিনীর যে-পরিচয়টি প্রকাশ পাইতেছে, সেইটিই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। অর্থাৎ আমরাও রোমান্সের একটি বিশেষ ভূমি হইতে নন্দিনীকে দেখিতে অভ্যস্ত হই। ফলে নন্দিনীর যে রূপটি হয়তো নাটকের কোন বিশেষ একটি চরিত্রের কাছেই প্রকাশমান, আমাদের মধ্যে বিশেষ একটি মনোভূমির সৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সেই রূপটিকেই একমাত্র করিয়া তুলি। ইহাতে নন্দিনীর অন্য দিকগুলি ভাবিয়া দেখি না, এবং মানবী নন্দিনীকে সহজেই অ-মানবী বলিয়া বোধ হয়।

দর্শকের (বা পাঠকের) মনে এই যে প্রথমেই নন্দিনীর সম্বন্ধে একটি সংস্কার জন্মিয়া যায়, ইহার জন্য কবি কতটা দায়ী এবং পাঠক বা দর্শক কতটা দায়ী তাহা বিবেচ্য। আমরা কবিকে বিশেষ দায়ী করি না, কারণ কবি এখানে নাট্য-ভঙ্গীর যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কবিকে চরিত্র-চিত্রণে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশে সংক্ষেপে কাজ সারিতে হইয়াছে। ইহার জন্য কবিকে অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় দৃশ্য এবং কাব্যধর্মী সংলাপ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। আবার নাটকের যাহা বিষয়বস্তু, তাহাতে কবি নন্দিনীকে দিয়া বাসন মাজাইবার অবকাশ পান নাই। এখন সেজন্য পাঠক যদি নন্দিনীকে কেবল আলো আর ফুল দিয়াই তৈয়ারী বলিয়া মনে করেন, যদি মনে করেন যে, নন্দিনী যখন অধ্যাপকের ভাষায় "আলোর সোনা", তখন তাহার মধ্যে আর রক্তমাংসের উপাদান নাই, তাহা হইলে তাহার জন্য কবিকে দোষ দেওয়া যায় না। তবু কবি আসরে নামিয়া একবারে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, বলিয়াছেন, মানবীর চিত্রই আমি আঁকিয়াছি, তোমরা তাহার উপাদানগুলি খুঁজিয়া দেখিও; কিন্তু আমরা কবিকে সহজে রেহাই দিই নাই, এখনও হয়তো রেহাই দিতে চাহি না। আমরা নন্দিনীকে অ-মানবী বলিয়া তাহার উপর তত্ত্ব আরোপ করি, তাহাকে রূপক করিয়া তুলি।

সুধীবৃন্দকে আমরা ইহাই অনুরোধ করি যে, নন্দিনীর কোন একটি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা যেন নাটকের মধ্যে নন্দিনীকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। তাহা হইলে আমাদের বাস্তব জীবনে একটি নারী যেমন তাহার চারিদিকে নিজের অজ্ঞাতেই আপন মাধুর্যের দ্বারা বিচিত্র তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তোলে, এবং বাহির হইতেও বিভিন্ন আলো আসিয়া তাহার উপর রঙ্ ফেলিতে থাকে, নন্দিনীকেও আমরা তেমনি একটি মানবীর চিত্র হিসাবে দেখিতে পাইব। সুধীগণকে আমরা এইদিক হইতে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তাঁহার নন্দিনীর মধ্যে মানবীর রূপটি খুঁজিয়া পাইবেন। দেখিতে পাইবেন এই মানবীর রূপটি প্রকাশ পাইতেছে তাহার সুখ-দুঃখের মধ্যে, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই সুখ-দুঃখ, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব লইয়াও নন্দিনী একটি বিশেষ মানবী। আমরা অতঃপর মানবী-নন্দিনীর সেই বিশেষ পরিচয়টি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"—ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর ধর্ম-জীবনের এই প্রার্থনাটি ঈশানি পাড়ার নন্দিনীর প্রেম-জীবনের মধ্য দিয়া একটি নূতন সুরে ধ্বনিত হইয়াছে, একটি রঙ্গীন দীপ্তি লাভ করিয়াছে। যক্ষপুরীর রাজা যখন আপনার রাশি রাশি উপকরণভারে পীড়িত, সঞ্চয়ের মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত এবং শক্তির দম্ভে বিশ্বজগৎ হইতে নির্বাসিত, তখন এই প্রেমময়ী রমণী এই বাণীটিকে আপনার অন্তরের বেদনার দ্বারা মণ্ডিত একটি মধুর করুণ আহ্বানের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। সেই আহ্বানটি হইল—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

এই আহ্বানের মাধুর্য নবীন জীবনের প্রাণোচ্ছ্বাসে, ইহার কারুণ্য যক্ষপুরীর লৌহ-জটিল বন্ধের প্রতিঘাতে। এই আহ্বানের মধ্য দিয়া সেই নারী আপনার গভীর প্রেমকে প্রকাশ করিয়াছে।

নন্দিনী পল্লী-বালা; বহু পৌষের পরিবেশ তাহার জীবনকে বর্ষে বর্ষে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই নন্দিনীর প্রেম যেন পৌষের পাকা ধান হইতে লাবণ্য নিয়াছে, হাওয়া হইতে নেশা নিয়াছে, ধরণী হইতে একটা প্রাণভরা খুশি

নিয়াছে। পৌষের পরিবেশ আমাদের মনে যে একটি আবেশ সঞ্চারিত করিয়া দেয় নন্দিনীর প্রেমে যেন সেই রকম একটি আবেশ অনুভব করি। নন্দিনী যেন পৌষের পরিবেশটি বহন করিয়া আনে। সেই দিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত্রের উদার উন্মুক্তি আর নীল আকাশের আলোর উৎসব নন্দিনীর মধ্যে দেখিতে পাই। তাই নন্দিনী যখন কাছে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহাকে শুধু রক্তমাংসের মানবী বলিয়াই মনে হয় না, সে যেন মূর্তিমতী আনন্দ বলিয়া মনে হয়।

যক্ষপুরীর বিকৃত জীবনের পরিবেশে কবি রবীন্দ্রনাথ এমনই একটি নারীকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার প্রেমের লীলায় সহজ সুখ, সহজ সৌন্দর্যের প্রকাশ। যক্ষপুরীর যে-জীবন আলোক হইতে বঞ্চিত, নন্দিনী সেখানে নূতন জীবনের বাণী লইয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রাণ অফুরন্ত, গান স্বতোৎসারিত, সৌন্দর্য অপরূপ হইয়া বিকশিত। যক্ষপুরীর অধিবাসীদের কাছে এই নারী এক পরম বিস্ময়। তাহার ললাটের দীপ্তিতে, আননের সৌকুমার্যে, বচনের প্রীতি-মধুর ভঙ্গীতে, রমণীয় বাহু দুটির সেবায়, যক্ষপুরীর মধ্যে সে যেন নূতন স্বর্গলোক রচনা করিয়া চলিয়াছে। যক্ষপুরীতে আরও অনেক নারী রহিয়াছে, চন্দ্রাকে দেখিয়া তাহাদের বুঝিতে পারি; কিন্তু নন্দিনী ইহাদের মধ্যে অনন্যা। এমন করিয়া গান তো কেহ গাহে নাই, এমন করিয়া স্নেহের সুরে কেহ তো ডাকে নাই, এমন করিয়া প্রেমের দৃষ্টিতে কেহ তো মুখের দিকে চাহে নাই। যেখানে সকলেই যেন কেমন রাগিয়া আছে, সন্দেহ করিতেছে কিংবা ভয় পাইতেছে, সেখানে এমন উদার প্রাণটিকে কে মেলিয়া ধরিল! তাহার কালো কেশে রক্তকরবীর মঞ্জরি, হাতে রক্তকরবীর কঙ্কণ, পরনে তাহার ধানী-রঙের শাড়ি। চারিদিকের কোলাহলের মধ্যে সে যেন সুর বাঁধা তম্বুরা।

এই তম্বুরার সুরে বিশুর গান গিয়াছে খুলিয়া, নবীন প্রাণের উদ্দীপনায় কিশোর উঠিয়াছে মাতিয়া, অধ্যাপকের পাকা হাড়েও লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি, এবং রাজার এতদিনের রাশিকৃত সঞ্চয়ের মধ্য হইতেও জাগিয়াছে একটা অতৃপ্তির, অপ্রাপ্তির বোধ। আর যক্ষপুরীর যে স্থানটিতে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার, যেখানে লোকে চুপিসারে কথা বলে, চোখ বাঁকা করিয়া তাকায়, বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে, সেখানে একটা বিরুদ্ধতা, একটা ক্ষোভ, একটা চাপা আক্রোশ গোঁ গোঁ করিয়া ওঠে। একটা

কালো হাওয়ার মত তাহা নন্দিনীকে স্পর্শ করিতে চায়, রাহুর মত নন্দিনীর দীপ্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়।

গোকুল বলে—সর্বনাশী ; বলে,—ডাইনী।

চন্দ্রা বলে,—রাক্ষসী ; বলে মায়াবিনী। তাহার প্রেমকে বলে,—সুন্দরিপনা। সর্দার মুখে কিছুই বলে না। নন্দিনীর হাত হইতে কুঁদফুলের মালা নেয়, অপেক্ষা করিয়া থাকে শেষ বোঝাপড়ার জন্য। এই কুঁদফুলের মালাটি নন্দিনী যক্ষপুরীর রাজার জন্য আনিয়াছিল।

নন্দিনীর মালা কিন্তু রক্তকরবীর। নন্দিনীর প্রেম এই রক্তকরবীর মালাই গাঁথিয়া রাখে। আজ কিন্তু নন্দিনী কুন্দফুলের মালা আনিয়াছে। ইহার পিছনে নন্দিনীর হৃদয়ের একটি গোপন গভীর বেদনা রহিয়াছে। সেই বেদনা বুঝিতে গেলে রক্তকরবীর ইতিহাসটি জানিতে হইবে।

নন্দিনীকে ঘিরিয়া তাহার গ্রামের ছেলেদের মধ্যে যখন হারজিতের খেলা চলিতেছিল তখন নন্দিনী তাহর বরণমাল্য হাতে অপেক্ষা করিয়াছিল পুরুষ-শ্রেষ্ঠের জন্য। এই স্বয়ম্বরের মধ্যে নন্দিনীর চাওয়ার রূপটি, প্রেমের রূপটি ধরা পড়ে। নন্দিনী সেই পুরুষকে কামনা করে, যৌবনের উদ্দাম বাসনায় যে শক্তিমান পুরুষ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নারীকে সবল বাহুর বন্ধনে বাঁধিতে পারে। পুরুষের যে-শক্তি নারীকে সঙ্গিনী করিবার সাধনায় বিকশিত, সেই যৌবন-শক্তির কাছে নন্দিনীর আত্মসমর্পণ। নন্দিনীর প্রেম সেই যৌবনের প্রতি প্রেম। ইহার মধ্যে কোন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতা, কোন সূক্ষ্মতর মানস-বিলাস নাই। ইহার মধ্যে প্রকৃতির একটি সহজ প্রেরণা রহিয়াছে, যে-প্রেরণা নন্দিনীর যৌবনের মধ্যে হিল্লোলিত হইয়া তাহাকে দেহে এবং মনে জীবন-রসাস্বাদনের অধিকারিণী করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে সে চিনিতে পারে, তাহার বাহু-বন্ধনের মধ্যে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া জীবনের চরিতার্থতাকে স্বীকার করিতে পারে। এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে আহ্বান করিবার অধিকারও সে রাখে। সে যে অপরূপ সুন্দরী ; যৌবন তাহার দেহের সীমায় সীমায় মূর্তিমান। সেই যৌবনের রাঙা আগুন নারী হৃদয়ের কল্যাণময়ী আবেগের দ্বারা শোধিত হইয়া অপূর্ব লাবণ্যময় দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকে। 'সেই দীপ্তিময়ী যৌবনের ছটা পুরুষের যৌবনের উদ্দাম বাসনাকে আমন্ত্রণ জানায়। যৌবন যৌবনের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বসৃষ্টির একটি ছন্দ পূরণ করিয়া দিতে চায়। সেই ছন্দটি মিলাইবার জন্য

তুফানের নদীতে দাঁড় টানিয়া, বুনো ঘোড়াকে কেশর ধরিয়া ছুটাইয়া, প্রাণ নিয়া সর্বস্বপণ করিয়া পুরুষ-শ্রেষ্ঠ আসিয়া নন্দিনীর বরণমাল্য অধিকার করিয়া বসে।

নন্দিনীর এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠটির নাম রঞ্জন। গ্রামের আর সব ছেলেদের পরাস্ত করিয়া রঞ্জনই নন্দিনীকে জিতিয়া লইয়াছে। রঞ্জনের নিবিড় বাহুর বন্ধনে নন্দিনী তাহার জীবনের প্রাপ্তিকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। রঞ্জনের এই প্রেমের আলিঙ্গনে সেই নিমীলিতাক্ষী স্ফুরিতাধরা বেপথুমানার ললাটে, কপোলে, অধরে রঞ্জনের নিকট হইতে একটি রাঙা আলো আসিয়া ছড়াইয়া পড়ে। সেই রাঙিয়া-ওঠা মুখটির দিকে তাকাইয়া রঞ্জন ডাকে—রক্তকরবী!

নন্দিনী বলে, "আমার রঞ্জনের ভালবাসার রঙ রাঙা।" আমরা জানি, নন্দিনীর প্রেমও একই রঙে রঙীন। তাহা না হইলে নন্দিনীর আননে রঞ্জনের প্রেমের দীপ্তি প্রতিফলিত হইত না। সেই প্রেমের রঙে রঞ্জিত নন্দিনীর মুখটিকে দেখিয়া রঞ্জনের রক্তকরবী ফুলের কথা মনে পড়ে। নন্দিনী যেন রঞ্জনের প্রেমে সেই ফুলের মতই রঙীন, তারই মত সুষমা ও সৌকুমার্য লাভ করে।

রঞ্জনের এই আহ্বান রঞ্জনের যৌবনের মোহ হইতে। সেই যৌবনের মোহে রঞ্জন নন্দিনীকে যে ভাবে দেখে তাহাকেই নামে ডাকিতে গিয়া রঞ্জন বলে—'রক্তকরবী।' এই আহ্বানের মধ্যে তাই রঞ্জনের প্রেম-মানসের একটি চিত্র পাই। রঞ্জনের প্রেমের মধ্যে যে রোমান্স রহিয়াছে, তাহারই ভাবে রঞ্জন নন্দিনীকে দেখিয়া থাকে। রঞ্জনের উদ্দাম বাসনা নন্দিনীর জন্য একটি বিশেষ মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লয়, এবং তাহারই মধ্যে নন্দিনীকে স্থাপন করিয়া নন্দিনীর একটি পরিচয় দান করে। রঞ্জনের প্রেমে মানবী নন্দিনী 'রক্তকরবী' হইয়া যায়।

রঞ্জনের এই আহ্বানের মধ্যে নন্দিনীরও তাই একটি আত্মজাগরণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে তাহার নারী-সত্তা আপনার ধর্ম বিশেষ করিয়া অনুভব করে। এ পরিচয়ে নন্দিনী তাই আনন্দিত। এই পরিচয় রঞ্জনের সহিত তাহার মিলিত জীবনের পরিচয়, ইহার মধ্যে শুধু নন্দিনীই নাই, রঞ্জনের প্রেমও রহিয়াছে। নন্দিনীর প্রেম রঞ্জনকে আপনার মধ্যে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে, রঞ্জনের প্রেমের মধ্যে নন্দিনী একই রঙে রঙীন হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নন্দিনী ও রঞ্জনকে তাই পৃথক করিয়া দেখিবার উপায় নাই। রাজা নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"রঞ্জনকে কি রকম ভালবাস।" উত্তরে নন্দিনী বলিয়াছিল,—

জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।"

কিন্তু রঞ্জনের যে শক্তি নন্দিনীকে কামনা করিয়া বিকশিত হইয়াছিল, বিষয়ান্তরের সাধনায় সেই শক্তি আজ ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। রঞ্জন আজ যক্ষপুরীর রাজা হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের আবেদন আজ তাহার কাছে ব্যর্থ, নন্দিনীর আহ্বানও আজ তাই আর তাহার কাছে পৌঁছায় না। যক্ষপুরীতে রাজাকে যেমন রঞ্জন নামে কেহ ডাকে না, নন্দিনীকেও তেমনি 'রক্তকরবী' বলিয়া কেহ ডাকিবার নাই। যক্ষপুরীতে নন্দিনীর এই পরিচয়টি সার্থকতা হারাইয়াছে। নন্দিনী কেন যে রক্তকরবীর আভরণ পরে, তাহা এখানে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সকলেই ভাবে, ইহার নিশ্চয় কোন একটা গূঢ় অর্থ আছে। অধ্যাপক তো সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনায় পড়িয়াছে। বুদ্ধির আঁচে তাহার হাড় গিয়াছে পাকিয়া, সব কিছুকেই সে বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া একটা অর্থ বাহির করিতে চায়। নন্দিনীর রক্তকরবীর আভরণের কি গূঢ়ার্থ থাকিতে পারে তাহা লইয়া তাহার দুর্ভাবনার অন্ত নাই। নন্দিনী বুঝাইয়া দিলেও সহজে কথাটি বুঝিতে চায় না, তাহার রঙের তত্ত্বটি লইয়া মাথা ঘামাইতে চায়। কিন্তু আমরা জানি, নন্দিনী কেন রক্তকরবীর আভরণ পরে। ইহার পিছনে একটি নারীসুলভ সেন্টিমেণ্ট রহিয়াছে। রঞ্জন নন্দিনীকে একদা 'রক্তকরবী' বলিয়া ডাকিত। এই আহ্বানের মধ্যে নন্দিনী রঞ্জনের প্রেম অনুভব করিত, আপনার পরিচয় অনুভব করিত। আজ রঞ্জন আর তাহাকে 'রক্তকরবী' বলিয়া ডাকে না, আজ সে রাজা হইয়া উঠিয়া জীবনের জটিলতার জালে প্রবেশ করিয়াছে। নন্দিনী কিন্তু রঞ্জনকে ভুলিতে পারে নাই। রক্তকরবী ফুলের সান্নিধ্যে আসিয়া সে রঞ্জনের আহ্বানকে, রঞ্জনের প্রেমকে অনুভব করিতে চায়। রক্তকরবী ফুলটির সহিত রঞ্জনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে, রক্তকরবীর ফুল দেখিলে রঞ্জনের নাম মনে পড়িয়া যায়। এই যে রক্তকরবী ফুলকে রঞ্জনের প্রেমের প্রতীকরূপে অঙ্গে ধারণ করা, ইহাতে রোমান্টিক মনের প্রকাশ রহিয়াছে। ইহা একটি নারীসুলভ সেন্টিমেণ্ট মাত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া রক্তকরবী ফুলের কোন তত্ত্ব নাই, ইহার মধ্য দিয়া প্রেমিকা নারীর একটি বিশিষ্ট মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেই প্রেম-জীবনের ব্যঞ্জনাটি ধরিতে না পারিয়া যক্ষপুরীর অধ্যাপক বৃথাই ইহার মধ্যে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, কোন একটি বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে হইলেই তাহা সাধনার অপেক্ষা রাখে, তা সে সাধনার প্রকৃতি যেমনই হউক না কেন। এখন, এই সাধনার দ্বারা আমরা যে পরিচয়টি লাভ করি, সেই পরিচয়টি আমাদের নিজেদেরই শুধু খুশি করে না, আমরা যাহাকে ভালবাসি, তাহার খুশিরও অপেক্ষায় থাকে। এইভাবে দেখি, জীবনের কর্মক্ষেত্রে আমরা সাধনার দ্বারা যে একটি শক্তি লাভ করি, সেই সাধনালব্ধ শক্তির মধ্যে আমাদের একটি আত্ম-পরিচয় থাকে। সেই পরিচয়টিকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কারণ তাহার মধ্যে আমরা নিজেকে খুঁজিয়া পাই। আবার প্রেমের মধ্য দিয়া আমাদের আর একভাবে আত্ম-পরিচয় ঘটে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার মধ্যে আমরা নিজেকে অনুভব করি, আমাদের আত্মধর্ম সেখানে প্রকাশ পায়। তাই যাহাকে ভালবাসি তাহার মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাই বলিয়া তাহার মধ্য দিয়াও আমাদের একপ্রকার আত্ম-পরিচয় ঘটে। এখন এই কর্মের সংসারে আমাদের যে আত্ম-প্রকাশ ঘটে, আবার প্রেমের জীবনে যে আত্ম-প্রকাশ ঘটে, এই দুই আত্ম-প্রকাশকে আমরা মিলাইয়া লইতে চাই, নতুবা উভয়ের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিতে থাকিলে আমাদের জীবন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া কোন একটির ক্ষেত্রে জীবন নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া উঠে। তাই যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে আমরা সহধর্মিনী করিয়া তুলিতে চাই, জীবনের কর্মক্ষেত্রে যে ফল আমরা অর্জন করি, প্রেয়সীর কাছে প্রেমের অর্ঘ্য হিসাবে তাহাকে নিবেদন করিয়া দিতে চাই। এইরূপে কর্মজীবনের ফলকে প্রেম-জীবনের অর্ঘ্য করিয়া তুলিতে পারিলে আমাদের আত্মোপলব্ধির দ্বৈধতা ঘুচে।

এইরূপে আমাদের মনোজীবনের এই একটি তত্ত্ব দেখিতে পাই যে, আমাদের যে কোন একটি বিশিষ্ট আত্ম-প্রকাশকে আমরা আমাদের প্রেয়সীর কাছে সমর্থিত করিয়া লইতে চাই। ইহার জন্য জীবনকে যে কেবল মাত্র প্রেম-জীবন ও কর্ম-জীবন—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রয়োজন নাই। আমাদের জীবনের বহু প্রকাশ ঘটিতেছে। তাহার মধ্যে যে প্রকাশটিতে আমরা বিশেষভাবে তৃপ্তি লাভ করি, যাহার মধ্যে একটি বিশেষ গৌরব অনুভব করি, সেই প্রকাশটিকে প্রেয়সীর কাছেও তুলিয়া ধরিতে চাই। তাহা প্রেয়সীর খুশির অপেক্ষা রাখে। এই খুশির সঙ্গে খুশি না মিলিলে এই খুশির বিষয়কে লইয়া জীবনে বিরোধ উপস্থিত হয়।

রঞ্জন নন্দিনীকে ভালবাসে। রঞ্জন যখন পল্লীর জীবনে ছিল, তখন তাহার জীবনের বিভিন্ন খুশিগুলিকে সে নন্দিনীর খুশির মধ্যে দেখিতে পাইত; রঞ্জন যদি তুফানের নদীতে দাঁড় টানিবার প্রস্তাব করিত, নন্দিনী তাহাতে অসম্মত হইত না; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরিয়া সে যখন আসিয়া হাজির হইত, নন্দিনীর প্রাণ-মনের উদ্দীপনায় তাহার খুশির বাণীটি সে পড়িয়া লইতে পারিত; নন্দিনীকে লইয়া সে যখন তোলপাড় করিতে থাকিত, নন্দিনীর অন্তরও তখন একই ছন্দে তাল রাখিয়া নৃত্য করিয়া যাইত।

কিন্তু তাহার পর দেখি, রঞ্জনের জীবনের মোড়টি ঘুরিয়া গিয়াছে। স্বর্ণের তৃষ্ণা তাহার শক্তিকে ভিন্ন পথে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার খুশির রূপান্তর ঘটিয়াছে। এমনই হয়; ব্রজের যে রাখাল তাহার বাঁশীর সুরে গোপীদের মন হরণ করিয়া বেড়াইত, সে দ্বারকার রাজা হইয়া যায়। তখন গোপীদের দূতীও দ্বারকার দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে, রাজার কাছে গোপীদের মর্মবাণী পৌঁছিতে পারে না। বুনো ঘোড়ার কেশর ধরিয়া নন্দিনীকে বনের মধ্য দিয়া ছুটাইয়া আনিবার মধ্যে রঞ্জন এখন আর কোন বাহাদুরী দেখে না, পূর্বের মতন নন্দিনীকে খুশি করিবার জন্য তুফানের নদীতে দাঁড় টানিবার আর সময় নাই; সে এখন কেমন করিয়া স্বর্ণ আহরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া নিত্য নূতন কৌশলে সেই স্বর্ণকে সাজাইতে হয়, তাহারই সাধনায় সে লিপ্ত। ইহার মধ্য দিয়া সে যে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হইতেছে তাহাতেই সে মুগ্ধ, সে খুশি।

এমনি করিয়াই চলিতে পারিত; কিন্তু রাজার বিধাতা ইহার মধ্যে কোথায় একটু ফাঁক রাখিয়া দিয়াছেন। তাই রাজার খুশি নন্দিনীর খুশিকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে, রাজার জীবনের ছন্দ নন্দিনীর জীবনের ছন্দের সহিত মিলিতে চাহিতেছে। ইহার মধ্যে মনোজীবনের যে তত্ত্ব রহিয়াছে, ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু নন্দিনীর খুশি রাজার খুশিকে স্বীকার করিতে পারিতেছে না; যক্ষপুরীর জীবনের বিকৃতি ও কৃত্রিমতা একদিকে তাহার কাছে উদ্‌ঘাটিত, অপরদিকে তাহার প্রেম রঞ্জনের প্রেমকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু রঞ্জনের খুশির সেই রাঙা রঙ আজ সোনালী হইয়া গিয়াছে, তাই খুশির সঙ্গে খুশির মিল হইতেছে না, তাই রাজা চটিয়া যাইতেছে।

নন্দিনীর খুশি কিন্তু রঞ্জনের খুশির প্রতীক্ষায় আছে। তাহাকে তো সে ভুলিতে পারে নাই, সে যে নিত্য জাগরিত বেদনার মধ্যে বাঁচিয়া আছে।

সেই খুশিকে মনে করিয়াই নন্দিনী রাজার কাছে তাহার খুশিকে আনিয়াছে। তাহাকে রক্তকরবীর রঙে রঙীন করিয়া আনিতে পারে নাই, কুন্দফুলের শুভ্রতার মধ্যে তাহাকে মেলিয়া ধরিয়াছে!

নন্দিনীর যে-প্রেম মিলনের মধ্যে বাসনা-রঙীন হইয়া ছিল, আজ প্রিয়-বিচ্ছেদের ব্যথায় সেই প্রেম দুঃখের স্পর্শে একটি অপূর্ব শুভ্রতা লাভ করিয়াছে। পাওয়ার ভূমিকায় যাহাকে রঙীন দেখিয়াছিলাম, উদ্দাম দেখিয়াছিলাম, আজ না-পাওয়ার ভূমিকায় তাহাকে সংযত দেখিতেছি, পবিত্র, একনিষ্ঠ দেখিতেছি। দুঃখের স্পর্শে রক্তকরবী ফুল আজ কুন্দফুলে পরিণত হইয়াছে, অভিসারিকার ব্যাকুল বাসনা আজ সতীর ধীর প্রতীক্ষায় পরিণত হইয়াছে। আজ নন্দিনী তাই রক্তকরবীর মালা আনে নাই, কুন্দফুলের মালা আনিয়াছে।

নন্দিনীর প্রেম-জীবনের এই দুইটি অধ্যায়কে নাট্যকার এইভাবে দুইটি ফুলের মালার ব্যঞ্জনায় উপস্থিত করিয়াছেন। রক্তকরবী নাটকের যে নাট্যভঙ্গী, তাহাতে ইহাকে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়া উপস্থিত করার সুযোগ নাই। ইহা একটি inner drama বা অন্তর্নাট্যের বিষয়। প্রত্যক্ষ ঘটনার সাহায্যে ইহাকে উপস্থিত করা চলে না। এখানে ঘটনার ব্যঞ্জনা হইতে সেই অন্তর্নাট্যকে বুঝিতে হইবে। রাজা ও রঞ্জন একই ব্যক্তি। রঞ্জনের জীবনের পরিবেশটি আজ বদলাইয়া গিয়াছে। নন্দিনী সেই একই ব্যক্তিকে একবার রক্তকরবীর মালা, আর একবার কুন্দফুলের মালা আনিয়া দিতেছে। অতএব ইহা রঞ্জনের প্রতি প্রেমে নন্দিনীর জীবনের দুইটি অধ্যায়, দুইটি বিভিন্ন পরিবেশে দুইটি বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী লাভ করিয়াছে মাত্র। নন্দিনীর প্রেমের এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে যে অন্তর্নাট্যটি রহিয়াছে, আমরা নাট্যবস্তুর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সেই অন্তর্নাট্যকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাকে স্ব-কপোলকল্পিত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই, কারণ এই অন্তর্নাট্যকে অনুসরণ করিয়া আমরা নন্দিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতিটি—নন্দিনীর প্রেম-জীবনের তৃতীয় অধ্যায়টি বুঝিতে পারি। পরিশেষে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

নন্দিনী রাজাকে বলিল,—কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্ম পাতায় ঢেকে এনেছি।

রাজা—নিজে পরো।

নন্দিনী—আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নন্দিনীকে কুঁদফুলের মালা মানায় না, কারণ কুঁদফুলের মালা রঞ্জনকে বাদ

দিয়া, ইহার মধ্যে নন্দিনীর সম্পূর্ণ পরিচয় নাই। নন্দিনীর প্রেম-জীবনের ইহা একটি মধ্যকালীন অবস্থা (Intermediate stage)। এই অবস্থা হইতে নন্দিনী উত্তীর্ণ হইতে চায়; ইহার মধ্য দিয়া তাহার প্রেম একটি পরিণতির দিকে গতি লাভ করিয়াছে মাত্র, এখানে তাহার প্রেমের স্থিতি নয়।

নন্দিনী যেমন রাজার জন্য পৌষের আহ্বান আনিয়াছে, আনিয়াছে কুঁদফুলের মালা, তেমনি একটি গান আনিয়াছে। পৌষের আহ্বান— রাজার জীবনের পরিবেশটিকে রূপান্তরিত করিবার জন্য, ফ্যাক্টরির কলকজার বন্ধন হইতে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেতের মধ্যে মনকে মুক্তি দিবার জন্য; কুঁদফুলের মালা—রক্তকরবীর কথা মনে ফিরাইয়া দিবার জন্য, রাজার মধ্যে যৌবনের সেই রঙীন বাসনাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য; আর এই গানটি আনিয়াছে রাজাকে অতীত দিনের কথা মনে করাইয়া দিবার জন্য, রাজাকে ভুলিয়া-যাওয়া প্রেমের স্মৃতিতে জাগরিত করিবার জন্য।

রাজাকে নন্দিনী তাহার অতীতের কথা মনে করাইয়া দিতে চায়। রাজা আজ যাহা হইয়া উঠিয়াছে, নন্দিনী কিছুতেই তাহাকে স্বীকার করিবে না। রঞ্জন আজ যত উপকরণ সম্ভারই গড়িয়া তুলুক না কেন, নিত্য-নূতন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়া যতই তাক লাগাইয়া দিক না কেন, নন্দিনী তাহাকে চরম বলিয়া কিছুতেই মানিয়া লইবে না, কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে প্রতাপের মধ্যেই পূর্ণতা। রাজা শক্তির যে দম্ভ প্রকাশ করিতেছে, তাহাকে সে শক্তির অপচয় বলিয়া ধিক্কার দিবে, জুজুর সাজ বলিয়া উপহাস করিবে। রাজাকে সে রঞ্জন নামে ডাকিবেই, তাহার প্রেমকে সে কামনা করিবেই, যে-প্রেম পল্লীজীবনের একটি সহজ ভোগের, সহজ সুখের, সহজ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। যাহা প্রয়োজনকে মিটাইতে গিয়া আপনাকে বিকাইয়া দিত না, জীবনের অন্নের চাহিদাকে, উপকরণের চাহিদাকে পৌষের উদার ক্ষেত্রের মধ্যে রাখিয়া দিয়া আপনাকে তাহার উপরে বাঁচাইয়া রাখিত। প্রয়োজন সেখানে প্রেমের সহিত বিরুদ্ধতা করে নাই, পরন্তু আপনাকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে রক্ষা করিয়া প্রেমকে বৃহত্তর সীমার মধ্যে মুক্তি দিয়াছে। যক্ষপুরীর জীবন প্রয়োজনের সীমাকে ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিয়া প্রেমের ক্ষেত্রকে ছোট করিয়া আনিতে আনিতে তাহাকে অবশেষে জীবনের একেবারে বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখন শুধু

একখানি হাত দিয়া যতটুকু প্রেম গ্রহণ করা যায়, তাহা অপেক্ষা বেশি পরিসর সে তাহাকে দিতে চাহে না।

এই প্রয়োজনের দোহাই দিয়া আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা পৃথিবীকে আজ যক্ষপুরী বানাইয়া তুলিয়াছে। কলকব্জার বাঁধনে তাহাকে এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে যে কোথাও যেন এতটুকু অপ্রয়োজনের অবকাশ না থাকে। কিন্তু অনন্ত আকাশ হইতে কখন এক ফাঁকে আলো আসিয়া পৌঁছায়, মাটির ভিতরের অন্ধকার হইতে আনন্দের বীজ প্রাণ পাইয়া বহু দিনের ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে, রক্তকরবীর পাপড়িতে পাপড়িতে আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা যেমন করিয়াই কষিয়া বাঁধন দিক না কেন, বিশ্বপ্রকৃতি তাহার মধ্য হইতে ফুল ফুটাইবেই, পাহাড়ের বুকে ঝরণা নামিবেই, চরিত্রের কাঠিন্য ভেদ করিয়া প্রেম জাগিবেই। যক্ষপুরী শাসনের দ্বারা যাহা গড়িয়া তুলিবে, স্বর্গের চক্রান্ত আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে, রক্তকরবীর রাঙা লিখনে বিদ্রোহ-বাণী ঘোষিত হইবে। যক্ষপুরীর সর্দার আসিয়া প্রয়োজনের কথা বলিয়া ভুলাইতে চাহিবে, সরকারি খরচে চৌকিদারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে, কিন্তু জীবন সে কথা শুনিতে চাহিবে না। সে বলিবে, সকল উপকরণের মধ্যেও আমাকে পৌষের পার্বণে গৃহে ফিরিতে দাও, আমাকে প্রেম আনিয়া দাও, আকাশ আনিয়া দাও। প্রয়োজন বলিয়া আধুনিক সভ্যতা যতই বিচিত্র উপকরণ হাতে তুলিয়া দিক না কেন, জীবন তাহাকে সম্পদ্ বলিয়া কিছুতেই মানিয়া লইবে না। সৌন্দর্য-বোধের অভাব, প্রেম-বোধের অভাব তাহাকে পীড়িত করিবেই। বিষয়টিকে সর্দার তুচ্ছ করিয়া হাসিয়া উঠিবে, কিন্তু রাজমহলের খিড়কীর দরজা দিয়া যে প্রেতের দল বাহির হইয়া আসে, যাহাদের বলা হয় রাজার এঁটো, শিখার ছাই,—তাহাদের তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিবে সে কোন্ সর্দারের হাসি ?

পল্লীর রঞ্জন আজ যক্ষপুরীর রাজা হইয়া উঠিয়া নন্দিনীর প্রেমকে অস্বীকার করে। নন্দিনী আজ তাহাকে রঞ্জন নামে ডাকিতেও পারে না। যক্ষপুরীর কঠোর নিয়মকানুনে রাজার সহিত সহজ ব্যবহার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নন্দিনীর প্রেম তো এই কৃত্রিমতাকে স্বীকার করিতে চাহে না। সে যে রাজাকে সেই পুরানো নাম ধরিয়া ডাকিতে চায়, জানাইতে চায়, 'আমি তোমার হারানো দিনের সখী' ; জানাইতে চায়, 'আমি ভালোবাসি'।

যক্ষপুরীর রাজাকে আর কোন দিক দিয়াই আজ ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই। নন্দিনী তাহার এই গানটি দিয়া ছুঁইতে চাহিয়াছে। নন্দিনী রাজাকে তাহার পুরানো দিনের কথা মনে করাইয়া দিতে চাহিয়াছে। নন্দিনীর গানটি হইল এই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।
সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদনহাসি।

'ভালোবাসি', এই কথাটি একদিন প্রিয়কে ঘিরিয়া সত্য হইয়া ছিল। আজ সেই প্রিয় কাছে নাই; তাই বলিয়া কথাটি তো মিথ্যা হইয়া যায় নাই। এই কথাটি আজ অন্তরের গভীর অনুভূতির মধ্যে একটি ভাবসত্য রূপে বিরাজ করিতেছে। আজ প্রিয়কে পাই না, কিন্তু এই প্রেম-মানসের মধ্যে প্রিয়কে নিবিড়ভাবে লাভ করি। অতীতে এক সময় ছিল, যখন প্রিয় কাছে ছিল; যখন 'ভালোবাসি' এই বাণীটি কত নিবিড় বাহুর বন্ধনে, ভীরু বক্ষের স্পন্দনে, আকুল আঁখির ক্রন্দনে, প্রিয়কে ঘিরিয়া পরিপূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করিত। আজ প্রিয়কে সেই ভাবে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাই না, প্রিয়ের জন্য ব্যাকুল বেদনা হৃদয়কে আপ্লুত করিয়া তোলে। আজিকার প্রেমানুভূতি এই বেদনার অনুভূতি। আজ প্রেমের অনুভূতিতে সেই মূর্তিকে ভোগের মধ্যে পাই না, কিন্তু বহু সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্মৃতির মধ্য দিয়া অভিনব আনন্দ-বেদনায় সেই মূর্তিকে বারবার স্পর্শ করিয়া যাইতেছি। আজ তাই 'ভালোবাসি' এই সুরটিতে চিত্ত বিশ্বব্যাপী অতল বেদনার মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে এবং সেই বেদনা বাহিয়া অতীত দিনের স্মৃতির স্বর্ণ-তরীতে পাল তুলিয়া দিতেছে।

রাজার রুদ্ধ হৃদয়ের কাছে নন্দিনীর এই গানের আবেদনটি বড়ই করুণ। কোন ক্ষোভ নাই, অভিযোগ নাই, তীব্র কোন প্রতিবাদ বা কলহ নাই; প্রিয়ের কাছে প্রেমের এই অভিমানটি শুধু সুরের মধ্য দিয়া জানানো হইয়াছে। প্রিয়কে শুধু মাত্র এই সুরেরই আঘাত দিয়াছে, আর কোন আঘাত নন্দিনী আনে নাই।

নন্দিনীর এই সঙ্গীতের অবতারণাটি 'রক্তকরবী' নাটকের inner dramaর রূপায়ণের একটি শিল্প-কৌশল। এখানে বাহিরের কোন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া রাজার পরিবর্তন দেখানো হয় নাই। রাজার পরিবর্তনটি যেমন মনোজীবনের বিষয়, পরিবর্তনের উপায়টিও সেইরূপ সূক্ষ্ম।

নন্দিনী বলিল,—পাগল ভাই, গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশু—ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে।

এখন, নন্দিনীর গান শুনিলে রাজার কেন মরিতে ইচ্ছা করে? ইহার মধ্যে রাজার মনোজীবনের একটি নাটক রহিয়াছে। এই গান শুনিয়া রাজার পূর্ব পরিচয়ের কথা মনে পড়ে, আবার নন্দিনীর প্রতি বাসনা জাগে, আবার রঞ্জন হইয়া উঠিতে সাধ যায়; অর্থাৎ রাজার মরিতে ইচ্ছা করে। নন্দিনীর এই গানটি, নন্দিনীর এই অভিমানটি রাজার কাছে সবচেয়ে বড় আঘাত। ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজার মনোজীবনের ঘটনা।

এইরূপে দেখি, নন্দিনীর যে-প্রেম তাহার পূর্বের পল্লীজীবনে রঞ্জনের সহিত মিলনে অপ্রতিহত ধারায় প্রবাহিত ছিল, যক্ষপুরীতে বাধার সম্মুখীন হইয়া আহ্বানে, অভিমানে ও প্রতীক্ষায় তাহা বিচিত্র কলধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সুর যত মধুর, তত সূক্ষ্ম। বিশেষ করিয়া নন্দিনীর জীবনের এই কলধ্বনি অন্তর্নাট্যের বিষয় বলিয়া ইহার প্রকাশের রূপটি বিশিষ্ট। সাধারণ ঘটনা প্রধান নাটকে প্রত্যক্ষ ঘটনার অবতারণায় পরিবেশকে এমন ভাবে তৈয়ারী করা হয় যে, চরিত্রের দ্বন্দ্ব পরিবেশ হইতে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়। এখানে নন্দিনীর জীবন-দ্বন্দ্বও পরিবেশের অধীন; কিন্তু এখানে পরিবেশকে মূলতঃ প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর সাহায্যে উপস্থিত করা হয় নাই। এখানে কতকগুলি মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া মানসিক পরিবেশ গড়িয়া তোলা হইয়াছে, এবং দ্বন্দ্বটিকে অন্তর্নাট্যের বিষয় করিয়া তোলা হইয়াছে।

নন্দিনীর প্রেমের রূপটি দেখিলাম, ইহার প্রকৃতিটিও তাহা হইতে বুঝিতে পারি। নন্দিনীর এই প্রেম বিশেষের প্রতি প্রেম, বাসনাময় প্রেম। বিশেষকে একান্ত করিয়াই ইহা আপনাকে বিকশিত করিয়াছে। এই প্রেমে প্রাপ্তির রূপটি তাই খুব স্পষ্ট—তাহা হইল জীবন-ভোগ। নন্দিনীর প্রেমে তাই যৌবনধর্মের প্রেরণাটি মুখ্য। এই প্রেম প্রথম প্রকাশের সময় চারিপাশের পুরুষদের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ রচনা করিয়া তোলে। নন্দিনীর প্রেম বিশেষের প্রতি বলিয়া না-পাওয়ার দুঃখকে নন্দিনী স্বীকার করিয়া লইতে চাহে না; তাহাকে দূর করিয়া প্রাপ্তির মধ্যে আপনার বাসনাকে চরিতার্থ করিতে চায়।

এই প্রেমকে স্থিতির প্রেম বলিতে পারি। বিশেষকে কেন্দ্রে রাখিয়া ইহা জীবনকে সেই কেন্দ্রের চারিপাশে আবর্তিত করায়। এই কেন্দ্রটি যদি স্থানচ্যুত হয়, তাহা হইলে সেই প্রেমের জীবনে একটি বিপর্যয় দেখা যায়। পল্লীর রঞ্জন যক্ষপুরীর রাজা হইয়া উঠায় নন্দিনীর জীবনে সেই বিপর্যয়টি আসিয়া দেখা দিয়াছে। নন্দিনীর প্রেমের কেন্দ্র আজ স্থান ভ্রষ্ট, নন্দিনীর প্রেম আজ তাই দ্বিধাগ্রস্ত। রঞ্জনের জীবন আজ যে পথ ধরিয়াছে, নন্দিনীর প্রেম আজ সে পথকে স্বীকার করিতে পারিতেছে না।

এই বিপর্যয়কে অতিক্রম করিয়াছে নন্দিনীর প্রেমের আন্তরিকতা ও এক-নিষ্ঠতা। প্রেমের এই নিষ্ঠাকে নন্দিনী বারবার প্রকাশ করিয়াছে, বারবার ঘোষণা করিয়াছে, রঞ্জনের সঙ্গে তাহার দেখা হইবেই। অর্থাৎ রঞ্জন জীবনের যে পথেই চলুক না কেন, নন্দিনী তাহার প্রেমের শক্তিতে রঞ্জনকে পুনরায় তাহার পূর্বের কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনিবে। নারী-প্রেমের এমনই একটি চিত্রকে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার রমণীয় পটভূমিকে আমাদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, সেই প্রেমের সৌন্দর্য ও মহিমা কতখানি এবং রাজার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার পক্ষে তাহার কতখানি শক্তি।

নন্দিনীর এই যে দীপ্ত প্রেম, তাহার পল্লীর জীবনে পুরুষদের মধ্যে যাহা একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিত, তাহাই আজ বিচ্ছেদ-বেদনার অশ্রুধারায় ধৌত হইয়া যক্ষপুরীতে সকলের সহিত একটি কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। সে আজ যক্ষপুরীর অধিবাসীদের দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী; তাহাদের সুখ-দুঃখের সমান ভাগ লইতে সে প্রস্তুত। এই সমবেদনার অধিকারী হইয়াই

সে যক্ষপুরীর বিকৃতিকে বুঝিতে পারিয়াছে, রাজার শক্তির দম্ভকে অবজ্ঞা করিতে পারিয়াছে। তাহার এই কল্যাণময়-প্রেমের জন্য আজ সে আর পুরুষের কাছে তৃষ্ণার বিষয় নহে, ভোগের লক্ষ্য নহে, আজ সে তাহাদের কাছে জীবনের আনন্দময় প্রেরণা, উপলব্ধির সামগ্রী। অধ্যাপক তাই নন্দিনীকে বলিয়াছে "আলোর সোনা"। কিশোর তাহাকে ফুল দিয়া পরিতৃপ্ত, বিশু তাহাকে গান শুনাইয়া খুশি। আর যে-বিশুকে নন্দিনী একদিন বাজি খেলার ভিড়ের মধ্যে ভালো করিয়া লক্ষ্যও করে নাই, আজ তাহাকে সে ডাকিয়াছে—পাগল ভাই!

এই 'ভাই' বলিয়া সম্বোধনের মধ্যে নন্দিনীর প্রেম-মানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, প্রেমের একটি বিশেষ উপলব্ধি দেখি। 'ভাই' এই কথাটির মধ্যে একটি ভোগ-বিরহিত আত্মীয়তার কথা রহিয়াছে। প্রেমের পাত্রকে যখন ভোগবাসনার বিষয় করিয়া দেখি তখন তাহাকে 'প্রিয়' নামে বা এমন অন্য কোন নামে ডাকি যাহার মধ্য দিয়া সেই রঙীন বাসনার ভাবটি প্রকাশ পায়। আর প্রেমের পাত্রকে যখন ভোগ-বাসনার ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেখি, তখন মন এমনই একটি কথা চয়ন করিয়া লয়, যাহার মধ্যে প্রেমটি প্রকাশ পায়, কিন্তু ভোগের বাসনাটির প্রকাশ থাকে না। এই 'ভাই' সম্বোধনে সেই ভাবটি প্রকাশ পায়। ইহার মধ্যে ভোগ-বাসনার ঊর্দ্ধে একটি বিশুদ্ধ প্রেম-মানসের পরিচয় আছে। বিশু নন্দিনীকে ভালবাসে; বিশুর এই প্রেমকে নন্দিনী একদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন রঞ্জনের পাশে আর কাহারও স্থান ছিল না। আজও নন্দিনীর প্রেম রঞ্জনের জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছে, কিন্তু এখন চলার পথে এই যে প্রেমটি হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে, ইহাকে নন্দিনী চাহি না বলিয়া ফেলিয়া দিতে পারে না। পথে চলিতে চলিতে পথের পাশ হইতে এই যে প্রেম আসে, ইহাকেও পাথেয় বলিয়া সম্মান দিতে হয়। কিন্তু রঞ্জনের আসনে ইহাকে বসাইবার উপায় নাই; নন্দিনী তাই 'সাথি' বলিয়া, 'পাগল ভাই' বলিয়া তাহাকে সঙ্গে রাখিয়াছে। করুণা করিয়া রাখে নাই, গভীর ভালবাসা দিয়া শ্রদ্ধা করিয়া রাখিয়াছে।

নন্দিনী বলিল—আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশুর মনে খেদ নাই। সে নন্দিনীকে গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত। বিশুর প্রেম-মানসের বিশ্লেষণে পরে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

কিশোরের প্রাণদানের ভূমিকায় নন্দিনীর প্রেমের আর একটি শক্তি-রূপ দেখিতে পাই। নন্দিনীর প্রেম কিশোরের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে, কিশোরের সমস্ত অন্তর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশু বলে, "মনে যে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে।"

কিশোর যক্ষপুরীর একটি কিশোরবয়স্ক খোদাইকর। নন্দিনীকে তাহার ভালো লাগিয়াছে, এই ভালো-লাগাকে সে প্রকাশ করিতে চায় নন্দিনীর ফরমাস খাটিয়া। নন্দিনীর কাজ করিয়া দিতে পারিলেই তাহার আনন্দ। নন্দিনী রক্তকরবীর ফুল ভালবাসে, কিশোর সেই ফুল যোগাড় করিয়া দিবার ভার সাধিয়া লইয়াছে। ইহাতে কিশোরকে কাজ কামাই করিতে হয় এবং সেজন্য নিদারুণ শাস্তিও পাইতে হয়। কিন্তু সকল শাস্তিকেই কিশোর তুচ্ছ করিয়াছে নন্দিনীর আনন্দে।

কিশোরের এই প্রণয়ের রূপটি অতি সুকুমার। নন্দিনীর সান্নিধ্যে আসিয়া, নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলিয়া সে সুখী। নন্দিনীর নাম ধরিয়া ডাকিতেই তাহার আনন্দ, নন্দিনী তাহার হাত হইতে ফুল লইলেই সে কৃতার্থ। তাহার প্রণয়ের আর কোন দাবি নাই, শুধু নন্দিনীকে উপলক্ষ্য করিয়া সে যেন আপনার উদ্দীপ্ত অন্তরকে প্রকাশ করিতে পারে। তাই নন্দিনীকে লাভ করা তাহার প্রণয়ের লক্ষ্য নয়, নিজেকে প্রকাশ করাই তাহার প্রণয়ের লক্ষ্য। নন্দিনীকে সে ডাকে নন্দিনীর জন্য নয়, ডাকিতে ভালো লাগে বলিয়া, সেই ছোট্ট ভাল-লাগাটির প্রতি লোভ আছে বলিয়া ডাকে। কিশোরের প্রেমের মধ্যে তাই ত্যাগের একটি ললিত বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। সর্দারের উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে নন্দিনীর জন্য ফুল আনিতে যায়, নন্দিনীর জন্য খুব বড়ো কিছু একটি ত্যাগ করিতে পারিলেই তাহার প্রণয় চরিতার্থ হয়। নন্দিনীকে বলে, "একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, কতোবার এই কথা মনে মনে ভাবি।" কিশোরের বয়স অল্প, ভোগের বাসনা তাহার মধ্যে এখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রণয়ের মধ্যে তাই একটি আত্ম-বিকিরণকারী দ্যুতি রহিয়াছে।

ত্যাগের একটি ললিত বিলাস রহিয়াছে। 'ত্যাগের বিলাস' বলিলাম এইজন্য যে, প্রেমের যে মহত্তর ধর্মে ত্যাগ স্বভাবজ হয়, কিশোরের প্রণয়ে সেরূপ অভিজ্ঞতা হয় নাই। কিন্তু কিশোর বয়স্ক বালকের প্রণয়ের মধ্যেও এক প্রকার ত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্যাগ আসে অন্তরের স্বপ্নাবেগ হইতে। প্রেম তখন প্রকাশের বিচিত্র পথ পায় নাই, ত্যাগটিকেই তখন অত্যন্ত সহজ করিয়া দেখে। এই ত্যাগের মধ্যে কোন প্রশ্ন নাই, কোন হিসাব-নিকাশ নাই, কোন অভিমানও নাই। অন্তরকে প্রকাশ করিবার, প্রেমকে নিবেদন করিবার ইহাই একটি সহজ পন্থা বলিয়া মনে হয়। এই ত্যাগের মধ্যে যত দুঃখ, ততই প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিয়া চিত্ত আনন্দিত।

"কথা ও কাহিনী"র 'পরিশোধ' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কৈশোর প্রেমের একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। বিষয় এক না হইলেও এই আত্মদানের মনস্তত্ত্বটি একই। উত্তীয় নামে একটি কিশোর বালক সুন্দরী-প্রধানা শ্যামাকে ভালবাসিয়াছিল। বজ্রসেনকে লাভ করিবার নিদারুণ বাসনায় শ্যামা সেই কিশোর প্রাণটিকে আহুতি দিয়াছে। শ্যামার মুখে শুনি,—

"বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর; সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি অপবাদ নিজ স্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।"

কৈশোরের প্রেম এই প্রাণ দেওয়া-নেওয়া নহে, তাহা আত্ম-বিচ্ছুরণের বিমল মহিমা, তাহা ভোগাবরণের উদ্ধত প্রকাশ নহে। মনে যে আগুন জলিয়া উঠে, সেই আগুনকে শুধু প্রকাশ করে, এবং হয়তো আপনিই আপনার খাদ্য হইয়া উঠে। যক্ষপুরীতে সুন্দরী-প্রধানা নন্দিনী কিশোরের মধ্যে এমনই একটি আত্মোদ্দীপ্ত প্রেম জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিশোর যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সর্দারের মারকে তাহার ভয় নাই, বন্দী বিশুর সহিত নিজেকে বদলাইয়া লইতে চায়, উদ্ধত স্পর্ধায় রাজাকে আক্রমণ করিতে যায়।

কিশোরের প্রেমের মধ্যে এই কৈশোর ধর্মটি প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া কিশোর কৈশোরের প্রতীক মাত্র নহে। কিশোরের মধ্যে জীবনেরই চিত্র রহিয়াছে। কিশোরের প্রাণদান সেই জীবনেরই বাস্তব পরিণতি। এই

পরিণতিকে অনেকে বাস্তবতার দিক দিয়া কৈফিয়ৎযুক্ত (justified) বলিয়া মনে করিতে না পারিয়া তাহার উপর হয়তো তত্ত্বের আরোপ করিতে চান। বুদ্ধির লজিক অনুযায়ী ইহাকে সমর্থন করিতে গিয়া জীবনের চিত্রকে প্রতীক করিয়া তোলেন। কিন্তু যক্ষপুরীতে এমন বাস্তব ঘটনাও ঘটিতে পারে, শুধু আমাদের জীবন-বোধের অভাবে আমরা সেই জীবনের ট্র্যাজেডিকে ধরিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ সেই জীবনেরই একটি চিত্র রক্তকরবী নাটকে উপস্থিত করিয়াছেন।

নন্দিনীর মত একটি নারী কিশোরের মত একটি সুকুমার বালকের মনে যে প্রণয়ের সঞ্চার করে এবং তাহাকে যে ভাবে বিকশিত করে তাহারই একটি চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন। সেই চিত্রের দিকে তাকাইলে আমরা নন্দিনীর মাধুর্যকেও বুঝিতে পারিব। যে মাধুর্যের একটি স্ফুলিঙ্গ আর একটি প্রাণকে প্রজ্বলিত করে, তাহার স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিব।

নন্দিনীর মধ্যে এই যে প্রেমের মাধুর্য, প্রাণের প্রাচুর্য ও দেহের সৌন্দর্য রহিয়াছে, তাহাতে নন্দিনীকে একটি মহিমা দান করিয়াছে, একটি শক্তির অধিকারিণী করিয়াছে। নন্দিনী সর্দারকে বলিয়াছে,—"আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।"

এই শক্তির প্রকৃতি কি? কিশোরের প্রসঙ্গে এই শক্তির একটি পরিচয় পাইয়াছি। পুরুষের জীবনে নারীর প্রভাবের যে প্রকৃতি, এই শক্তির প্রকৃতি সেইরূপ। কিশোরের বিশেষ আধারে এই শক্তি আপনাকে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। আবার বিশুর উপর তাহার প্রভাব আর এক রকম। এই শক্তিই রাজাকে ভিতরে ভিতরে কাবু করিয়াছে। নন্দিনী কিন্তু এই নারীশক্তির প্রতীক নহে, একটি বিশেষ জীবনাধার মাত্র। শক্তির প্রতীক নহে বলিয়া নন্দিনীরও তাই সীমা আছে; তাহার অসহায়ত্ব আছে, নিরুপায়ের দুরাশা আছে, নিষ্ফলের ক্রোধ আছে। সর্দার, গোঁসাই, এদের চক্রান্ত হইতে বিশুকে বাঁচাইবার ক্ষমতা তাহার নাই; বৃথাই গোঁসাইয়ের জপমালা লইয়া টানাটানি করে, রাজার দরজায় আকুল আঘাত হানে। যক্ষপুরীর অবিচারে তাহারও ক্রোধের সঞ্চার হয়, যাহাকে অধ্যাপক বলে 'রক্তকরবীর ঝঙ্কার।' শকুন্তলু, অনুপ, কঙ্কু, ইহাদের দুরবস্থা দেখিয়া নিরুপায় অন্তর হাহাকার করিয়া উঠে।

নন্দিনীর এই শক্তির প্রয়োগই বা কিরূপ, ক্ষেত্রই বা কোথায়? আনন্দের দ্বারা জীবনকে জয় করাই ইহার পদ্ধতি। ইহার প্রয়োগ আমাদের মনো-জীবনের কাছে; ইহার আবেদন আমাদের সৌন্দর্যবোধের কাছে, প্রেমবোধের কাছে, আনন্দবোধের কাছে। নন্দিনী তাই গান আনিয়াছে, মালা আনিয়াছে, সেবা আনিয়াছে। তাহার প্রেম রাজার কাঠিন্যকে, বিমুখতাকে জয় করিবে, নিজের এই আত্মশক্তিতে নন্দিনী বিশ্বাস রাখে। তাই সে সর্দারের কাছে স্পর্ধা করিয়াছে, আর রাজার মনের বন্ধ দরজায় বারবার আঘাত দিয়াছে। বলিয়াছে, আমার প্রেম তোমার অপেক্ষায় রহিল, তোমাকে বাহিরে আসিতেই হইবে। বলিয়াছে, বুকের উপর দিয়া তোমার ওই বিপরীত পথগামী জীবনের চাকা চলিয়া যাক, তবু নড়িব না, সরিব না; যতক্ষণ না আমার পথে নামিয়া আস, ততক্ষণ তোমারই অপেক্ষায় রহিল আমার আহ্বান, আমার মালা, আমার গান।

এইভাবে আহ্বান দিয়া, মালা দিয়া, গান দিয়া, এই শক্তির প্রয়োগ। বিষয়গুলিকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, বাহিরের জগতের ঘটনার প্রকৃতি একরকম, মনোজগতের ঘটনার প্রকৃতি আর এক-রকম। একটি তুচ্ছ ঘটনাও মনোজগতে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই অন্তর্নাট্যের কথা বলিয়াছেন।

এই আহ্বান, এই মালা, এই গানও যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলেও নন্দিনীর শেষ অস্ত্র, চরম অস্ত্র রহিয়াছে।

নন্দিনী বলিল,—রাজা, এইবার সময় হ'ল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

নন্দিনীর প্রেম, তথা নারীর প্রেম যে রাজার জীবনে, তথা পুরুষের জীবনে অপরিহার্য, একথা রাজা স্বীকার করিতে চায় না, কারণ রাজার জীবনের চাহিদা ভিন্ন পথ ধরিতে চাহিয়াছে। তাই রাজা নন্দিনীকে তাহার জীবন হইতে একেবারে বাদ দিবার কথাও কল্পনা করিতে পারে। নন্দিনীকে একেবারে

অবলুপ্ত করিয়া দিবার শক্তি হয়তো রাজার আছে, কিন্তু নন্দিনীকে জীবন হইতে সরাইয়া দেওয়ার অর্থ প্রেমকে জীবন হইতে নির্বাসিত করা। ইতিপূর্বে ভাববস্তু-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, জীবনের স্বভাবে জীবন আনন্দকে সৃষ্টি করিয়া চলে। জীবনকে আনন্দ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিবার উপায় নাই। জীবন স্পর্ধা করিয়া আনন্দকে একেবারে বাদ দিয়া ফেলিতে পারে বটে, কিন্তু আনন্দের মৃত্যুতে জীবন নিজের কাছে নিজে হারিয়া যায়। আনন্দের মৃত্যু তখন জীবনকে প্রতি মুহূর্তে মারিতে থাকে। তখনও যদি জীবনের প্রাণশক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জীবনকে নিজের প্রয়োজনেই আবার আনন্দকে জন্ম দিতে হয়। এইরূপে আনন্দ আপনার মৃত্যু দিয়া আপনি জীবনের উপর জয় লাভ করে। মনোজীবনের এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে নন্দিনীর প্রেম-জীবনের দ্বন্দ্বে প্রয়োগ করিয়াছেন। রাজা নন্দিনীকে মারিয়া ফেলিতে পারে, জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তখন নন্দিনীর অভাব রাজাকে মারিতে থাকিবে। আপনার মৃত্যু দিয়া নন্দিনী আপনার জয় অর্জন করিয়া যাইবে। নন্দিনীর তাই আর কোন অস্ত্র নাই, নন্দিনীর অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা জালের পর্দার বাহিরে আসিয়াছে, আপনার ধ্বজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, নন্দিনীর হাতটি আপনার হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এইবার রাজা আবার পূর্বের রঞ্জন হইয়া উঠিবে। কিন্তু যক্ষপুরীর এতদিনের বিধানকে তো সহজে সরানো যাইবে না, যক্ষপুরীর সর্দার তো পথ রুধিয়া দাড়াইবে, মকররাজকে রঞ্জন হইতে দিবে না, তাঁহাকে রাজা করিয়াই রাখিতে চাহিবে।

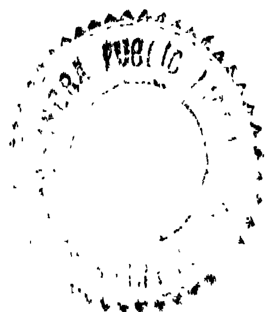
তাহার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন। রাজার সংগ্রামে যক্ষপুরীর পরিবেশ আবার বদলাইয়া যাইবে, আবার পল্লীর স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ রচিত হইবে, আবার আকাশ ভরিয়া শুনা যাইবে পাকা ফসলের গান। আর যে রক্তকরবীর মালা কুন্দফুলের মালায় পরিণত হইয়াছিল, মৃত্যুর মহিমায় তাহা আবার রক্তকরবীর মালা হইয়া উঠিবে। নন্দিনী বলিয়াছে,—'ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।'

এই যে বুকের রক্ত দিয়া, আপনার মৃত্যু দিয়া কুঁদফুলের মালাকে রক্তকরবীর রঙ করিয়া দিয়া যাইয়া, ইহাই নন্দিনীর অন্তর্নাট্যের পরিণতি। নন্দিনীর প্রেমজীবনের যে অন্তর্নাট্যকে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া আসিয়াছি, ইহাই হইল তাহার তৃতীয় অধ্যায়। নন্দিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ইহারই দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রলয়ের পথে তাহার দীপশিখাকে লইয়া রাজা ভাঙ্গিতে চলিল সর্দারের বিধান। সর্দারের বর্শা নন্দিনীকে বিঁধিলে নন্দিনীর বুকের রক্তে কুন্দফুলের মালা সিক্ত হইয়া উঠিবে। তখনও তাহাকে 'রক্তকরবী' বলিয়া কেহ কি চিনিয়া লইতে পারিবে না? নন্দিনীর প্রেমকে তখনও কি কেহ বুঝিবে না?

ফাগুলাল বলিয়াছে,—"ওই দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।"

পথের ধুলা হইতে এই রক্তকরবীর মালাকে যে তুলিয়া লইল, সে হইল পাগল বিশু। নন্দিনীর প্রেমকে সে-ই চিনিয়া লইয়াছে, তুলিয়া ধরিয়াছে। এই বিশু পাগলের কথা স্পষ্ট করিয়া না বুঝিলে 'রক্তকরবী'র প্রেম-জীবনের আনন্দ-রসটি, হারানোর মধ্য দিয়া প্রাপ্তির ধ্যান-বাণীটি উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না।



নবম অধ্যায়

বিশু

'রক্তকরবী' নাটকের ভাববস্তু প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বিশু চরিত্রটি নাটকের ভাবকেন্দ্রে রহিয়াছে। মৃত্যুর উপলব্ধিতে বিকৃত-জীবন হইতে সহজ জীবনে উন্নতি—রক্তকরবী নাটকের এই ভাববস্তুটি রাজার চরিত্রের মধ্য দিয়া আংশিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই ভাববস্তুটিকে রবীন্দ্রনাথ যে নাট্যকাহিনীর মধ্যে শিল্পায়িত করিয়াছেন, রাজা সেই নাট্যকাহিনীর নায়ক। কিন্তু ভাববস্তু রাজার চরিত্রের পরিণতিকেও ছাপাইয়া আছে। রাজার মধ্যে মৃত্যুর বোধ জাগিয়াছে, তাহাতেই রাজা সহজ জীবনের পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। কিন্তু বিশু বিকৃত-জীবন হইতে সহজ জীবনে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। তাহার সংগ্রাম সমাপ্ত প্রায়। তবু অবশেষে সে যে লড়াইয়ে গিয়াছে তাহা আর সকলের জন্য, তাহার নিজের লড়াই শেষ হইয়াছে। আমরা অতঃপর বিশুর জীবন-বিকাশটি বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

রক্তকরবী নাটকের নাট্য-কাহিনী হইতে বিশুর যে জীবন-কথাটি পাই তাহা হইল সংক্ষেপে এই ঃ—নন্দিনী নামে একটি মেয়েকে বিশু ভালবাসিত। নন্দিনীকে লাভ করিবার বাসনায় তাহার যৌবন-শক্তির কিছুটা প্রকাশ ঘটিয়াছিল, কিন্তু নন্দিনী সেই পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, যে সকলকে হারাইয়া দিয়া তাহাকে জয় করিয়া লইতে পারিবে। বিশু কিন্তু কি মনে করিয়া এই বাজিখেলার ভিড় হইতে চলিয়া আসিল, তাহার প্রেমকে গোপন করিয়া রাখিল তাহার অন্তরের অন্তঃপুরে।

তাহার পর বিশু যক্ষপুরীর গহ্বরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে তাহার স্ত্রী ; পরে সেই স্ত্রী স্বর্ণের তৃষ্ণায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশু যক্ষপুরীতে লাগিয়াছিল গুপ্তচরের কাজে, সে কাজে সে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না। যক্ষপুরীর জীবনের বিকৃতি তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এই পীড়নের মধ্যে, এই বিকৃতির মধ্যে যক্ষপুরীতে আলোক বঞ্চিত দেশে বিশুর দুঃখের দিনগুলি কাটিয়াছে। এমন সময় নন্দিনীকে যক্ষপুরীতে দেখা গেল। দেখা গেল, রঞ্জনের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। বিশুর প্রেম নন্দিনীকে চিনিয়া লইল, নন্দিনী আসিয়া খুঁজিয়া পাইল সান্ত্বনা। নন্দিনী বিশুর কাছে নূতন প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইল।

বিশুর প্রেম দুঃখের দহনে নূতন রূপ লাভ করিয়াছে, নন্দিনীর প্রেরণায় যক্ষপুরীর বিরুদ্ধে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশু সত্যের প্রতি সচেতন হইয়াছে এবং অবশেষে সত্যের মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

এইরূপে দেখি নারী-প্রেমের মধ্য দিয়া বিশু জীবনের যে দুঃখের প্রতি সচেতন হইয়াছে, তাহাতেই বিশু সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আমরা অতঃপর একে একে বিশুর প্রেম, বিশুর দুঃখ, বিশুর মৃত্যুর বোধ এবং বিশুর মুক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

যক্ষপুরীর জঠরের মধ্যে আসিবার পূর্বে বিশুর জীবনে নন্দিনীকে ঘিরিয়া প্রেমের যে উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহার চিত্রটিকে বিশু নন্দিনীর কাছে মেলিয়া ধরিতে পারে নাই। তাহার কারণ এই যে, পুরুষের প্রেমকে নন্দিনী যে ভাবে চিনিয়া লইতে অভ্যস্ত ছিল, বিশু তাহার প্রেমকে সে ভাবে উপস্থিত করিতে পারে নাই। তবু কিছুটা বিশু আর সকলের মত মাতিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মাঝপথে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। বিশু কেন যে বাজি খেলার ভিড় হইতে একলা চলিয়া গেল, সে কথা বিশু প্রকাশ করিয়া যায় নাই। তাহার চোখের চাহনিতে হয়তো তাহার কোন ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে ইঙ্গিত পড়িয়া লইতে পারে, প্রেমের সে দীক্ষা নন্দিনীর ছিল না। নন্দিনী পুরুষের বাসনার উদ্বেলতাকে চিনিয়াছে, কিন্তু প্রেমের বেদনাঘন আকাঙ্ক্ষাকে চিনে নাই। যে হাতখানি তাহার কোমল করপল্লবের দিকে আগাইয়া আসে সেই হাতখানির আবেদনকে সে জানিয়াছে, কিন্তু যে হাতখানি তাহার হাতখানিকে মুঠার মধ্যে ধরিতে গিয়াও ফিরিয়া যায়, তাহার ভাব-ব্যঞ্জনাকে সে বুঝিতে পারে নাই। তাই সে বিশুকে ফিরিয়া ডাকে নাই, তাহার প্রেমকে কোন প্রশ্ন শুধায় নাই, কিছুটা বিস্ময় লইয়া চুপ করিয়া গিয়াছে।

বিশুর প্রেম আমাদের নিকটেও হয়তো অপরিচিত থাকিত। যক্ষপুরীর পেষণের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া, আনন্দের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি কয়েকটি নিরুপায় আকুতির মধ্য দিয়া, সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি অস্ফুট বিশ্বাসের মধ্য দিয়া এবং অত্যাচারের প্রতি, অধর্মের প্রতি নিষ্ফল প্রতিবাদের মধ্য দিয়া হয়তো মাঝে মাঝে তাহা চমক দিয়া উঠিত। তাহারই ঝলকানিতে বিশুর মুখের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে মনে হইত, কী একটা কথা তাহার মধ্যে রহিয়াছে, কী একটা গভীর বেদনা সে সকলের অগোচরে বহন করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতাম না,

বিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে-ও বুঝাইতে পারিত না। শুধু তাহার খাপছাড়া কথাবার্তায়, ভিন্ন ধরণের আচরণে মাঝে মাঝে তাহারই বার্তা যেন অর্থ হারাইয়া যাওয়া লিপির মত প্রকাশ পাইত। সে লিপি আমরা পড়িয়া লইতে পারিতাম না। তাই হয়তো একটু হাসিয়া, একটু করুণা করিয়া বলিতাম—লোকটা পাগল!

এই পাগলের পাগলামিকে কে বুঝিবে? কে বুঝিবে, ইহার মধ্যে ফল্গু-ধারার মত প্রেমের কী গভীর বেদনা বহিয়া চলিয়াছে! যক্ষপুরীতে বিশু কাহার কাছে সে বেদনাকে মেলিয়া ধরিবে? সে কি ফাগুলাল,—চন্দ্রা,—যক্ষপুরীর অধ্যাপক?

বিশুর এই প্রেম হয়তো যবনিকার অন্তরালেই থাকিয়া যাইত; ভিতরে ভিতরে তাহা বিশুর জীবনকে লইয়া খানিকটা ভাঙ্গা-গড়ার কাজ করিত, বাহিরে তাহা প্রকাশের পথ পাইত না। কিন্তু এমন সময় যাহাকে লইয়া তাহার প্রেম-বেদনা, সেই নন্দিনী আসিয়া তাহাকে মধুর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—পাগল ভাই! সেই আহ্বানে বিশুর এতদিনের অবরুদ্ধ বেদনা বাহির হইয়া আসিতে চাহিল, তাহারই প্রকাশ পথ খুঁজিতে গিয়া নূতন করিয়া বিশুর জীবন-নাট্য হইল সুরু। বিশু গাহিয়া উঠিল—

মোর স্বপন তরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।

বিশুর এই নূতন জীবন-নাট্যের মধ্যে তাহার এতদিনের অবরুদ্ধ প্রেমের লীলা ধরা পড়িয়াছে। যাহা যবনিকার অন্তরালে ছিল, তাহা হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যমান হইয়াছে। সেই প্রেমের রূপটিকে বুঝিবার পূর্বে বিশুর পুরাতন জীবন-নাট্যটি, অর্থাৎ যক্ষপুরীর জীবনটিকে বুঝিয়া দেখা যাক।

বিশুর যক্ষপুরীতে আসিবার ইতিহাসটি এই;—বিশু বলে, "একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে (বিশুর স্ত্রী) দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা ক'রে বললুম, 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নিচে।" বিশু তথাকথিত আদর্শবাদী নহে, পুণ্যের বাঁধা ধরা রাস্তায় পথ চলিতে সে অভ্যস্ত হয় নাই। বিশুর স্পর্ধা জীবনকে জয় করিবার বাসনা, সুধা ও বিষকে সমভাবে পান করিয়া

জীবনকে উপলব্ধি করিবার আনন্দ। তাই বিশুর স্ত্রী যখন বিশুর সামর্থ্যের যাচাই করিতে চাহিয়াছে, বিশু তখনও পিছাইয়া পড়ে নাই। বিশু কিন্তু বুঝিতে পারে নাই, এই সামর্থ্য যাচাইয়ের অর্থ কি, বুঝিতে পারে নাই, ইহার পরীক্ষা দিতে গেলে জীবনের কোথায় তলাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পুরুষের একটি সাধারণ মনস্তত্ত্বই হইল এই যে, নারী যখন তাহার সামর্থ্যকে যাচাই করিতে চায়, পুরুষ তখন তাহাতে সাড়া না দিয়া পারে না। পুরুষ তাহাতে আপনার পৌরুষকে, আপনার শক্তিকে প্রকাশ করিতে চায়। ইহার মধ্যে পুরুষের যেন একটি প্রকৃতিগত প্রবণতা রহিয়াছে। কিন্তু নারী যখন পুরুষের কাছে অমৃতকে কামনা করে না, প্রেমকে কামনা করে না; কামনা করে স্বর্ণকে, কামনা করে জীবনের উপকরণকে, তখন পুরুষের যে শক্তি প্রেমের পথে নিয়োজিত হইয়া সার্থক হইয়া উঠিতে পারিত, সেই শক্তি বিকৃত পথ ধরিয়া পুরুষকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। পুরুষের জীবনে ট্র্যাজেডির এই একটি দিক রহিয়াছে। নারীর কাছে আপনার পৌরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুর্বার অভিলাষে পুরুষ নারীর বাসনাটিকে যাচাই করিয়া দেখিতে পারে না। যে পৌরুষ এমন করিয়া আপনাকে বিকাইয়া দেয়, সে পৌরুষ বাহিরে যতই শক্তির দম্ভ প্রকাশ করুক না কেন, আত্ম-সম্বিতের অভাবে সে পৌরুষ ভিতরে ভিতরে দুর্বল। নারীর বিকৃত-বাসনা সেই পৌরুষের হাল ধরিয়া থাকে। আপনার শক্তিকে প্রকাশ করিবার উত্তেজনায় ও নারীকে খুশি করিবার তৃপ্তিতে কর্ণধারের এই বন্ধনটিকে সে ভুলিয়া যায়। তারপর যখন আঘাটায় গিয়া তরী লাগে, যখন বুঝিতে পারে জীবনে যেখানে আসিতে চাহিয়াছিল, যেখানে আসা উচিত ছিল, সেখানে পৌঁছানো হয় নাই,—তখন হয়তো ঘোর ভাঙে।

আর নারী?

শয়তান তাহার কানে কানে চুপিসারে কথা কয়; তাহার চোখে লাগে সোনালী রঙের নেশা, উপকরণের তৃষ্ণায় তাহার সমস্ত সত্তা যেন শুকাইয়া উঠে। সেই মরিয়া যাওয়া, শুকাইয়া যাওয়া সত্তার একটা জ্বালাময়ী দাহ নয়নের তীব্র কটাক্ষে, বাঁকা হাসির ভঙ্গিমায়, বচনের চতুর ছলনায় প্রকাশ পায়। পুরুষের সামর্থ্যকে যাচাই করিতে বসে। পুরুষের প্রেমের সামর্থ্যকে তো সে কামনা করে না, কামনা করে তাহার স্বর্ণ-আহরণের সামর্থ্যকে। তাই যাহা প্রেমের আধার, তাহাকে স্বার্থ-সাধনের উপায় বলিয়া দেখিতে তাহার বাধে না; যে শক্তি আনন্দের মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করিত, তাহাকে অপ-প্রয়োজনের

মধ্যে বিকৃত করিয়া তুলিতে তাহার বাধে না। আর এই প্রেমের সম্বন্ধ, আনন্দের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই স্বর্ণ-আহরণে-অক্ষম পুরুষকে সে সহজেই ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে।

আধুনিক সভ্যতার যক্ষপুরীতে পাপ বাসা বাঁধিয়াছে একদিকে পুরুষের শক্তির দম্ভের মধ্যে, আর একদিকে নারীর প্রবল স্বর্ণতৃষ্ণার মধ্যে। নারীর স্বর্ণতৃষ্ণা পুরুষের শক্তির দম্ভকে আশ্রয় করিয়াছে, এইরূপে নারী ও পুরুষে মিলিয়া পৃথিবীতে নরক রচনা করিয়া চলিয়াছে। বাহির হইতে এই নরককে বুঝিবার উপায় নাই, উভয়ের মধ্যে মনে মনে যেন একটা আপোষ হইয়া গিয়াছে, উভয়ে জীবনকে এই ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বিকৃতিকে স্বভাব করিয়া তুলিয়াছে।

হায় নারী, মেঘের স্বর্ণপুরী দেখিয়া মুগ্ধ সেই চক্ষু দুইটির কাছে তোমার আর কি কিছু চাহিবার ছিল না! সে যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারিত, সমস্ত অন্তর দিয়া আপনাকে নিবেদন করিয়া দিতে পারিত, জীবনের সুখে-দুঃখে তোমাকে সঙ্গে করিয়া হাসি মুখে আনন্দের পথে চলিতে পারিত। তাহার ভালবাসাকে সম্পদ্ বলিয়া বুঝিলে না, তাহার আনন্দকে শক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিলে না, তাহার সঙ্গীতকে হৃদয়ের অর্ঘ্য বলিয়া বরণ করিলে না। তাহার সমস্ত মূল্য কি স্বর্ণ-আহরণের শক্তি দিয়া যাচাই করিয়া দেখিলে, তাহার সমস্ত পৌরুষের এমন করিয়া অসম্মান ঘটাইলে!

বিশুর স্ত্রী বিশুর স্বর্ণ-আহরণের অক্ষমতায় তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রা ইহাকে পাপ বলিয়া ধিক্কার দিয়াছে। আমরা বলি, বিশুর স্ত্রীর পক্ষে ইহাই একমাত্র পুণ্যকর্ম। বিশুকে ছাড়িয়া গিয়া বিশুর স্ত্রী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে; মুক্তি দিয়াছে স্বর্ণের নিত্য দাসত্ব হইতে, মুক্তি দিয়াছে বিকৃত স্বভাবের বন্ধন হইতে।

কিন্তু বিশুর জীবনের চরম দুর্গতি ঘটিয়া গিয়াছে। যক্ষপুরীর আশাহীন আলোহীন জঠরের তলায় সে তলাইয়া গিয়াছে।

বিশু যক্ষপুরীতে গুপ্তচরের কাজে ভর্তি হইয়াছিল। পৃষ্ঠব্রণের মত খোদাই-করদের পিছনে তাহাকে লাগিয়া থাকিতে হইত; যেমন সিদ্ধি, তেমনি তার সাধন। সেই নিরানন্দ নিষ্প্রেম জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে কি বিশুর মনে হইত না যে জীবনের অন্তরতর কোন প্রেরণা আছে, যে-প্রেরণায় জীবনের প্রকাশ আরও সহজ হইয়া উঠে, আরও সুন্দর হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে কি

তাহার সাধ হইত না যক্ষপুরীর এই পেষণকে অস্বীকার করিয়া আবার পূর্বের জীবন ফিরিয়া পাইতে। তখন কি তাহার অন্তরের অন্তঃপুরে নিভৃত দেশটিতে কোন একটি ভুলিয়া-যাওয়া অনিন্দ্যসুন্দর মুখ জাগিয়া উঠিত না, জাগিয়া উঠিত না মধুর হাসির ভুলিয়া-যাওয়া অস্ফুট কলধ্বনি, দুইটি কাজল কালো চক্ষুর গভীর দৃষ্টি!

কি জানি; বিশু সে কথা কাহারও কাছে বলে নাই, আমরাও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমরা এইটুকু জানি যে যক্ষপুরীর বিকৃত-জীবনকে বিশু চরম বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। বিশু গুপ্তচরের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ফাগুলালদের দলে আসিয়া ভিড়িয়াছে। আমরা তাই অনুমান করি, নন্দিনীকে বিশু ভোলে নাই। নন্দিনীকে দেখিয়াছিল বলিয়াই সৌন্দর্যের প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে, আনন্দের প্রতি তাহার নিষ্ঠা আছে। তাই বুঝি যক্ষপুরীর অন্ধকারের মধ্যেও সে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই বুঝি যক্ষপুরীর বিধিবিধানের বিরুদ্ধে সে মাঝে মাঝে খাপছাড়া কথা বলিয়া ফেলে, তাই বুঝি সে পাগল!

যক্ষপুরীর বিকৃতির মধ্যে কেমন করিয়া বিশু প্রেমের বেদনাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিল, কেমন করিয়া আনন্দের প্রতি নিষ্ঠাকে বজায় রাখিতে পারিল, কেমন করিয়া নন্দিনীর আহ্বানে সাড়া দিবার ক্ষেত্র জীবনে তৈয়ারী করিয়া রাখিতে পারিল? জীবন যখন পাপের পথে চলে তখন তাহার গতি ধ্বংসের দিকে; এই পাপের পথে চলিয়াও বিশু শেষ পযন্ত কেমন করিয়া রেহাই পাইয়া গেল?

বিশুর জীবনের এই পরিবর্তনের মূলে যে একটি জীবন-তত্ত্ব রহিয়াছে, আমরা অতঃপর সেই জীবন-তত্ত্বটিকে বুঝিয়া দেখিব। ইতিপূর্বে ভাববস্তু-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, উত্তম আনন্দের পথে চলিলে জীবনের সত্যকে এবং সেই সত্যের ভূমিকায় জীবনের মুক্তিকে লাভ করা যায়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছি যে, জীবনের ধর্মেই উত্তম আনন্দের ধর্মগুলি মুখ্য হইয়া উঠে। আনন্দের Negative ধর্মগুলি জীবনকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়, কিন্তু জীবনের ধর্ম হইল আপন অস্তিত্বকে বজায় রাখা; তাই মৃত্যু হইতে জাগিয়া উঠিবার জন্যই জীবন উত্তম আনন্দকে মুখ্য করিয়া তোলে। বিশুর জীবনও পাপের পথে, অধর্মের পথে চলিতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার জীবনের মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার পিছনে একটি তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা হইল জীবনের মধ্যে মৃত্যুর তত্ত্ব। এই মৃত্যু-তত্ত্বের মূলেও আনন্দ-তত্ত্ব বা জীবনের প্রকাশ-তত্ত্ব রহিয়াছে। ভাববস্তু-প্রসঙ্গে

সেই আনন্দ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি, আমরা অতঃপর জীবনের মধ্যে মৃত্যুর এই তত্ত্বটির আলোচনা করিব।

এই মৃত্যু-তত্ত্বের অবতারণাকে কেহ যেন অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে না করেন। বিশুর জীবন-বিকাশের মূলে এই যে মৃত্যু-তত্ত্বের কথা বলিব, ইহা আমাদের আরোপিত নহে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসায় এই মৃত্যুর তত্ত্বটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের মধ্যে নানা-দিক দিয়া দেখিয়াছেন এবং নানাভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশুর জীবন-বিকাশের মধ্য দিয়াও রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুর তত্ত্বকে একভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মৃত্যুর দর্শনটির বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ আমরা এখানে পাইব না, শুধুমাত্র বিশুর জীবন-বিকাশকে বুঝিবার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা মৃত্যু-তত্ত্বকে বুঝিবার চেষ্টা করিব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিশুর জীবন-বিকাশের আলোচনায় এই মৃত্যু-তত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা বলিব, সেই প্রয়োজন রহিয়াছে। বিশুর কথাবার্তা হইতেই এই তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তবে রক্তকরবী নাটকের নাট্য-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে তাহার খুব বিস্তারিত প্রকাশ নাই। এখানে বহু কথাই অল্প কথার মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশুর জীবন-বিকাশের একটি গূঢ়-তত্ত্বও অল্প কয়েকটি কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সহিত মিলাইয়া আমরা তাহার পাঠটি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই কথাই বলিব।

যক্ষপুরীর বিকৃত-জীবনের মধ্য হইতে, তাহার আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্য হইতে বিশুর জীবনে একটি গান জাগিয়াছে। এ সঙ্গীত আনন্দ-বেদনার সঙ্গীত নহে, সৌন্দর্য পিপাসার আকুতি নহে, প্রেমের কোন গভীর অভিব্যক্তি নহে। ইহা কেবল নিষ্পেষিত জীবনের মৃত্যুর সঙ্গীত। নানাপ্রকার বিকৃতির মধ্যে যখন প্রাণ যায় শুকাইয়া, তখন সেই প্রাণের মৃত্যুতে বিশুর জীবনে একটি সঙ্গীত জাগিয়াছে। বিশুর গানটি হইল এই ;—

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে
তবে মরণ-রসে নে পেয়ালা ভরে।
সে-যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।

তোর স্বর্গ ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে,
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি
লুপ্তিনেশার চরমসাথি,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিক-ভোলাবার ঘোরে।

জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ দুইভাবে দেখিয়াছেন। এক হইল দৈহিক মৃত্যু, আর এক হইল মানসিক মৃত্যু। এই উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে কখনো চরম বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ নূতন জীবন-লাভের উপায় বলিয়া দেখিয়াছেন। এই নূতন জীবনকে রবীন্দ্রনাথ দৈহিক মৃত্যুর দিক দিয়াও দেখিয়াছেন আবার মানসিক মৃত্যুর দিক দিয়াও দেখিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ একই জীবন-তত্ত্বে আসিয়া পৌছিয়াছেন। এই জীবনকে রবীন্দ্রনাথের কথায় 'বিশ্বজীবন' বা 'বৃহত্তর জীবন' বলিতে পারি। জীবনকে এই উভয়বিধ মৃত্যুর মাধ্যমে দেখাতে কবির কাছে 'বিশ্বজীবন' বা 'বৃহত্তর জীবনে'র রূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই বৃহত্তর জীবনকে কবি আরও নানাদিক হইতে দেখিযাছেন; দেখিয়াছেন সৌন্দর্যবোধের দিক হইতে, আনন্দ বোধের দিক হইতে; দেখিযাছেন প্রেমের দিক হইতে, দুঃখের দিক হইতে; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ওতঃপ্রোতভাবে মৃত্যুর নিযমকে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনের মধ্যে মৃত্যুর এই নিয়মকে আবিষ্কার করা রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি অসামান্য দান। এই মৃত্যুকে কবি দুই ভাবে দেখিয়াছেন; আমরা এখানে দৈহিক মৃত্যুর কথা না বলিয়া মানসিক মৃত্যুর কথা বলিব।

আমাদের জীবন-যাপন অর্থে শুধুমাত্র দৈহিক অস্তিত্বকে বজায় রাখা বুঝায় না, সকলের সহিত যোগে আমাদের একটা মানসিক অস্তিত্বকেও [আধ্যাত্মিক অস্তিত্বও বলিতে পারি] বজায় রাখিতে হয়। দৈহিক অস্তিত্ব লোপ পাইলে আমাদের জীবনের অবসান হয় বটে, কিন্তু আমাদের মানসিক অস্তিত্বে আঘাত লাগিলে আমরা দেহের অস্তিত্বকে বজায় রাখিয়া আর একভাবে মরিয়া থাকি। দেহে বাঁচিয়া থাকিলেই তাই আমাদের জীবনযাপন সার্থক হয় না, দেখিতে হয় যে, সেই সঙ্গে আমাদের মনও বাঁচিয়া আছে কি না। এই মনে বাঁচিয়া থাকার অর্থ হইল বিশ্বের সহিত মানসিক যোগকে বজায় রাখা অর্থাৎ মনের মধ্যে বিশ্বকে অনুভব করা। দৈহিক অস্তিত্বকে বজায় রাখিতে গেলে আমাদিগকে

যেমন অনেকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, তেমনি মানসিক অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিতে গেলেও আমাদিগকে মনোজীবনের অনেক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। সেই নিয়মগুলি হইল আধ্যাত্মিক। তাহা হইল প্রেমের নিয়ম, সৌন্দর্যের নিয়ম, আনন্দের নিয়ম। ইহার দ্বারাই আমরা বিশ্বের সহিত যুক্ত হইতে পারি, আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে বজায় রাখিতে পারি। আমাদের মধ্যে এই যোগের যতই অভাব হইতে থাকে, আমাদের মানসিক অস্তিত্ব ততই খণ্ডিত হইতে থাকে এবং আমরা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া যাই। যাহার সহিতই আমরা মনোজীবনের যোগটি অনুভব করিতে পারি না, তাহার সম্বন্ধেই আমরা মৃত্যুযাপন করি। এইরূপে দেহে বাঁচিয়া থাকিয়াও আমরা অনেক সময় ভিতরে ভিতরে মরিয়া যাই, জীবনযাপন মৃত্যু-যাপনের নামান্তর হইয়া উঠে।

আমরা আমাদের স্বার্থের দ্বারা, অহঙ্কারের দ্বারা, ভেদবুদ্ধির দ্বারা জীবনের মধ্যে এই মৃত্যু রচনা করিয়া চলি। আমাদের লোভ, মোহ, বিকৃত বাসনা এই মৃত্যুকে রক্ষা করিয়া চলে। এইরূপে আমরা জীবনযাপন অর্থে কোনরূপে টিঁকিয়া থাকি মাত্র। আমাদের দেহটা বাঁচিয়া থাকে কিন্তু ভিতরের মানুষটা মরিয়া যায়। অথচ এই মৃত্যুকে আমরা দূর করিতে চাহিনা, ইহাকে জীবনের মধ্যে সযত্নে পোষণ করিয়া চলি। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'মৃত্যুর গুপ্ত-প্রেম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কবি যখন বলিয়াছেন,

তোমারে আবরিয়া ধুলিতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি,
তবুও তাই ভালবাসি।—

কবি তখন এই মৃত্যুর কথা বুঝাইয়াছেন। এই মৃত্যু নানা ছদ্মবেশে জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, নানা ছলনায় আমাদিগকে ভুলাইতে থাকে। এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতের অধিকারী হইতে হইবে, কবি রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি অন্যতম জীবন-বাণী। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই মৃত্যুর বিভিন্ন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তকরবী নাটকে যক্ষপুরীর বিকৃত-জীবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর এমনই একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। যক্ষপুরীর অধিবাসীরা জীবনের নামে মৃত্যুযাপন করিতেছে।

এই মৃত্যুতে আমাদের জীবনে উত্তম আনন্দের ধর্মগুলি লোপ পায়।

জীবনের প্রকাশ তাহাতে সংকীর্ণ ও রুদ্ধ হইতে থাকে। তখন আনন্দের অভাব জীবনকে পীড়া দিতে থাকে। জীবনের স্বভাবে জীবন উত্তম আনন্দের ধর্মগুলিকে পুনরায় মুখ্য করিয়া তোলে। জীবন তখন মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে চায়। এইরূপে মৃত্যুই জীবনকে আঘাত দিয়া জীবনকে অমৃতের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

জীবনের মধ্যে মৃত্যুর নিয়ম ইহাই। জীবন যেখানেই স্বভাব হইতে, সহজের পথ হইতে বিচ্যুত হইবে, জীবনের মধ্যে মৃত্যু জাগিয়া উঠিয়া জীবনকে আঘাত দিয়া তাহাকে পুনরায় সহজের পথে আনিয়া দিবে। জীবনের মধ্যে মৃত্যুর এই ক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মৃত্যু তাই জীবনের বিনাশ নহে, মৃত্যু জীবনকেই সহজ পথে চালিত করিবার উপায়। তাই এক দিক দিয়া দেখিলে মৃত্যুকে যেমন দীন বলিয়া, অনভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়, অপর দিকে সেই মৃত্যুকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মহান্ রূপে বোধ হয়। একই মৃত্যু ;—একদিকে দীন, অপর দিকে মহান। আমরা যেখানে মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকি মৃত্যু সেখানে দীন ; আর মৃত্যু সেই অংশে মহান্, যেখানে আমাদের মধ্যে মৃত্যুর বোধ জাগিয়া উঠে, যেখানে মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আমরা নূতন জীবনে উন্নীত হই। 'বর্ষশেষ' কবিতায় মৃত্যুর দীন ও মহান্ এই দুই রূপের কথা কবি অতি নিপুণভাবে বলিয়াছেন। যেখানে তুচ্ছভাবে দিন যাপনের গ্লানি জীবনকে অধিকার করিয়া আছে, মৃত্যু সেখানে দীন ; আর যেখানে সেই মৃত্যুর বোধ হইতে বিশ্বজীবনে উন্নীত হইবার প্রেরণা অনুভব করি, মৃত্যু সেখানে মহান্।

আমাদের জীবনে এই মৃত্যুর নিত্য-নূতন নাট্যলীলা চলিতেছে। কবি বলেন, তাহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই ; বলেন—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন লবে।

বলেন, মৃত্যু ছদ্মবেশ পরিয়া কতক্ষণ থাকিবে, তাহাকে আমরা কি অমৃতের দূত বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিব না? মৃত্যু আমাদের নিদারুণ পীড়া দিয়া, গভীর দুঃখ দিয়া আসিবে, কিন্তু তাহাকে বৃহত্তর জীবনে উন্নীত হইবার উপায় বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। বলিতে হইবে—

এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রু সলিল সিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্ত পাবন,
এসো গো পরম দুঃখ নিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয় ;
এসো সংগ্রাম, এসো মহাভয়
এসো গো মরণসাধন ।

আমরা কি যাচিয়া মৃত্যুকে ডাকিব? তাহা নহে; জীবনের নিয়মে মৃত্যু যখন আমাদের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন যেন তাহাকে আমরা চিনিয়া লইতে পারি। হে অমৃত! আমরা আমাদের অপূর্ণতার জন্য, অক্ষমতার জন্য জীবনের মধ্যে বারবার মৃত্যু রচনা করিয়া চলিয়াছি। মৃত্যু আমাদিগকে জীবনের সীমার কাছে আনিয়া দিতেছে, সেখান হইতে পলকের জন্য যেন তোমার দিব্য জ্যোতিকে দেখিতে পাইতেছি। তাহারই জন্য মৃত্যুর বিষকে আমরা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছি। আমাদের অপূর্ণতা পূর্ণতাকে প্রমাণ করিতেছে, আমাদের দীনতা মহিমাকে প্রচার করিতেছে, আমাদের মৃত্যু অমৃতকে প্রকাশ করিতেছে। তাই মৃত্যু আমাদের কাছে সমাপ্তি নহে, মৃত্যু আমাদের কাছে পথ মাত্র। আমরা তাই মৃত্যুর মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাই না, আমরা মরিয়া গিয়া বাঁচিয়া উঠি। হে অমৃত! তুমি কৃপা করিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে এমন একটি নিয়ম রাখিয়াছ বলিয়াই আমরা রক্ষা পাইয়া গেলাম। আমাদের কবি তাই বলেন—

যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলারে !

জীবনের মধ্যে যাঁহারা অমৃতকে আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সার্থক। আমরা যাহারা অক্ষম, যাহারা অপূর্ণ, যাহারা সীমায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছি, আমরা অমৃতের আস্বাদ পাইলাম না; কিন্তু অমৃত লাভের উপায় বলিয়া মৃত্যুকে এইভাবে আস্বাদন করিতে পারি। নব-জীবনের অভিসার বলিয়া মরণের গান গাহিতে পারি। মৃত্যু তখন আমাদের কাছে আস্বাদনের বিষয় হইয়া উঠিয়া রসে পরিণত হইয়া যায়।

বিশু তাহার গানের মধ্যে এই মরণ-রসের কথা বলিয়াছে। বলিয়াছে, প্রাণের রস যখন শুকাইয়া যায়, তখন মরণ-রসে জীবনের পেয়ালা ভরিয়া নাও। তিমির রাত্রি আসিয়া ক্লান্ত আঁখির উপর যবনিকা টানিয়া দিবে, কিন্তু মৃত্যুকে যদি মৃত্যু বলিয়া চিনিতে পার, তবে হয়তো বাঁচিয়া যাইবে।

যক্ষপুরীর আর সকলের কাছে মৃত্যু যখন দীন, মৃত্যু যখন বিভীষিকা, সকলেই যেখানে মৃত্যুকে ভুলিয়া আছে, তখন বিশুর কাছে মৃত্যু কেমন করিয়া রসে পরিণত হইয়া গেল?

মৃত্যু তাহার কাছেই রসে পরিণত হয়, মৃত্যুর বেদনাকে যে সত্য বলিয়া সহজভাবেই সহিতে পারে, মৃত্যুর বিষকে যে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারে। বিশুর দুঃখ মৃত্যুর বিষকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে। এই দুঃখ-বোধের অভাবেই যক্ষপুরীতে আর কেহ মরণ-রস পান করিতে পারে নাই। বিশুর সেই দুঃখ বোধের কিছু পরিচয় লওয়া যাক।

বিশুর দুঃখের রূপটি একটু বিশিষ্ট। ইহা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতির হাহাকার নহে; যে দুঃখ জীবনকে নিত্য নব চেতনায় উন্মেষিত করে, ব্যক্তি-জীবনের আবেগের বন্দিত্ব হইতে বিশ্বজীবনের আনন্দ-চেতনায় চিত্তকে যাহা বিনির্মুক্ত করে, বিশুর দুঃখ সেই শ্রেণীর দুঃখ। বিশুর দুঃখ আনন্দের অভাব নহে, তাহা জীবনের এমন একটি অবস্থা যে অবস্থায় জীবনকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি, যাহার দ্বারা জীবনের রহস্য, জীবনের বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। সে অবস্থা হয়তো সুখকর নহে, কিন্তু সে অবস্থাতেও জীবনের সহিত একপ্রকার পরিচয় ঘটে বলিয়া, জীবনকে আর একভাবে উপলব্ধি করিতে পারি বলিয়া, তাহা এক হিসাবে আনন্দের সৃষ্টি করে। কবি রবীন্দ্রনাথ দুঃখের এমনই একটি রূপকে স্বীকার করিয়াছেন। 'ধর্ম' গ্রন্থে দুঃখের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যে মনোরম ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেখানে কবি বলিতেছেন,—

"জগতের অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ।

"অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশতঃ খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে এই ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা যেখানে সংসারের মধ্যে আমাদের ক্ষতির হাহাকার লইয়া থাকি, সেখানে দুঃখকে বড়ো করিয়া এই মহৎ অর্থে দেখিতে পাই না। সে ক্ষেত্রে দুঃখ আমাদিগকে 'দুঃখ' দিতে থাকে। কিন্তু দুঃখকে এত ছোট করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। কবি বলেন, "দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু।...মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর কিছুই হইতে পারে না।"

বিশুর মধ্য দিয়াও এই দুঃখবাদই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুও বলিয়াছে, "এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো-দুঃখ আর নেই।" তাই বিশুর চরিত্র-বিশ্লেষণে এই দুঃখবাদের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিশুর মধ্য দিয়া দুঃখের এই রূপকেই আমরা দেখিতে পাই। তবে, নাটকের মধ্যে যাহা আভাসের দ্বারা জানানো হইয়াছে, আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে তাহারই একটি চিত্র উপস্থিত করিলাম। আমরা দেখিলাম যে বিশুর দুঃখ-বোধই বিশুকে যক্ষপুরীর মৃত্যুর বিষ কণ্ঠে ধারণ করাইতে পারিয়াছে, মৃত্যু বিশুর কাছে রসে পরিণত হইয়াছে এবং এই মরণ-রস পান করিয়াছে বলিয়াই বিশুর মধ্যে নব-জীবনের অভিসারের অবকাশ রচিত হইয়া গিয়াছে। তাই বুঝি বিশু গুপ্তচরের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ফাগুলালদের দলে আসিয়া মিশিয়াছে, তাই বুঝি সে মাঝে মাঝে যক্ষপুরীর বিধি-বিধানের মধ্যে পাগলামি করিয়া বসে।

বিশুর মধ্যে এই দুঃখকে জাগাইয়াছে নন্দিনীর প্রতি বিশুর প্রেম। সেই প্রেমের দ্বন্দ্ব হইতে বিশু মহৎ দুঃখের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বিশু বলে,—"কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।"

আমরা ইতিপূর্বে রঞ্জনের প্রেমে নন্দিনীকে 'রক্তকরবী' রূপে দেখিয়াছি, এখন আমরা তাহাকে বিশুর 'স্বপনতরীর নেয়ে' বলিয়া দেখিব, দেখিব তাহার 'দুখজাগানিয়া' বলিয়া। আমরা অতঃপর বিশুর এই প্রেমের কথা বলিব।

নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাছে প্রথমেই যে একটি বিশিষ্টতা অর্জন করে, তারা সাধারণতঃ প্রকৃতির প্রেরণায়। ইহার মধ্যে স্থূল যৌনতৃষ্ণা রহিয়াছে। এই তৃষ্ণা মানবিক হৃদয় বৃত্তির দ্বারা শোধিত হইয়া নানা রঙ্ ও দীপ্তি লাভ করিলেও ইহা কোন মহৎ সৃষ্টি কার্যে লাগিতে পারে না, কারণ ইহার প্রকাশ

বিচিত্র হইলেও ইহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। একস্থানে আসিয়া ইহা ঠেকিয়া যায়; ভোগেই ইহার সমাপ্তি। এই ভোগের পথে বাধার সৃষ্টি হইলে জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই বটে, কিন্তু জীবন এখানে দেহের সীমার মধ্যেই থাকিয়া যায় বলিয়া, নিতান্তভাবে রূপেরই অধিগত থাকে বলিয়া, জীবনের কোন মহত্তর বিকাশ ঘটে না। বিষয়ের ভোগই এখানে লক্ষ্য বলিয়া জীবন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে থাকে, আপনার কোন আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করিবার অবকাশ এখানে থাকে না। নন্দিনীর প্রসঙ্গে আমরা ইহাকে স্থিতির প্রেম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

এইরূপে আমাদের বাসনা যখন রূপকে লইয়া থাকে, যখন কাছের জিনিসকে লইয়া থাকে, তখন তাহার একপ্রকার প্রকাশ ঘটে। তখন তাহার নিজের মধ্যেও যেমন উদ্দামতা, উচ্ছলতা, চাঞ্চল্য; চারিপাশেও তেমনি রেশারেশি, দ্বেষাদ্বেষি।

কিন্তু আমাদের জীবন সব সময়েই রূপকে চরম বলিয়া স্বীকার করে না, রূপকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না। আমাদের জীবনে একটি ভাবের দিক রহিয়াছে; এই ভাব কিছুটা রূপের দ্বারা প্রভাবিত, কিছুটা রূপের অতীত। যেটুকু রূপের অতীত সেটুকু শূন্য নহে, সেটুকু কোন বৃহত্তর রূপের ধ্যান। রূপ যেখানে আমাদের মধ্যে এই ভাবটিকে জাগাইয়া তোলে, সেখানে রূপের সঙ্গে আমাদের যোগটি শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গত ভোগের অধীন হইয়া পড়ে না; সেখানে তাহা মানসধ্যানে-প্রসন্ন হইয়া উঠে। মাঝখানে এই মানস-ধ্যানটি থাকাতে, এই ভাবের আকাশটি থাকাতে রূপের সহিত আমাদের জীবনের একটি দূরত্ব রচিত হইয়া যায়। যাঁহারা ভাবের সাধক, তাঁহারা রূপের সহিত এই দূরত্বটি রক্ষা করিয়া চলেন।

নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে একদিকে যেমন রূপ ও রূপ-ভোগের তত্ত্ব রহিয়াছে, আর একদিকে তেমনি ভাব ও ভাব-সাধনার তত্ত্বও রহিয়াছে। নারী পুরুষের মধ্যে একদিকে যেমন ভোগতৃষ্ণার বাসনা জাগায়, অপরদিকে তেমনি ভাবসাধনার আকাঙ্ক্ষাও জাগায়। আকাঙ্ক্ষা বলিতে বুঝি ধ্যানের অধীন যে বাসনা, এই ধ্যান হইল একপ্রকার আত্মরতি; এই আত্মরতি প্রেম-ও বটে। আকাঙ্ক্ষা তাই বাসনাকে অস্বীকার করিয়া নহে, বাসনাকে ধ্যানের দ্বারা শোধন করিয়া। ইহাতে প্রাপ্তি-বিষয়ের স্থূল আবেদনটি নাই, তাহার অন্তর এক আবেদন, অন্যতর এক পরিচয় আছে। এই নূতন পরিচয়

ধ্যানীর কাছেই সত্য, অন্যের কাছে নহে। এই ধ্যান রূপকে একেবারে বাদ দিতে চায় না, রূপকে নবতর করিয়া সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাকে অপূর্ব করিয়া তুলিতে চায়। রূপকে এই অভিনব করিয়া দেখিবার বৃত্তিকেই বলি আকাঙ্ক্ষা। রূপের সাধনা হইল 'কাছের পাওনা'র জন্য বাসনা, আর অভিনবের সাধনা হইল 'দূরের পাওনা'র জন্য আকাঙ্ক্ষা।

প্রেমজীবনে এই ভাবের পথটি, তথা ধ্যানের পথটি ধরিয়াছিল বলিয়াই রূপের দিকে হাতটি বাড়াইয়াও বিশু হাতটিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। নন্দিনীকে বিশু ভোগের মধ্যে চরম করিয়া চাহে নাই, তাহার ভাবসাধনার মধ্যে পরম করিয়া চাহিয়াছে। বিশুর এই ভাবসাধনা হইল বিশুর প্রেম। নন্দিনী এই প্রেমের আধার।

এই প্রেমে নারী ভোগের লক্ষ্য না হইয়া ভাবের প্রেরণা হইয়া দাঁড়ায়। তখনও সেই কাজল কালো চক্ষু দুইটির দিকে নয়ন ধাবিত হয়, কিন্তু দৃষ্টিতে তৃষ্ণার আকুতি থাকে না, তাহাতে অন্যতর কি একটি গভীর বেদনা ব্যক্ত হইয়া উঠে। তখনও সেই কোমল কর-পল্লবটির দিকে বাহুটি প্রসারিত হয়, কিন্তু স্থূল (?) হাতটিকে না ধরিয়া একটি ভাব-অঙ্গকে যেন জড়াইয়া ধরে। অর্থাৎ আধারটি সেই নারী-দেহ, কিন্তু একটি ভাবের মাধ্যমে তাহাকে লাভ করিতে চাহি বলিয়া সেই নারী-দেহটি যেন একটি ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে। যাহা স্থূল ছিল তাহাকে সূক্ষ্ম দেখি; দেহের দ্বারা দেহকে আলিঙ্গন করিলে সীমায় আসিয়া চিত্ত ঠেকিয়া যাইত বলিয়া ভাবের দ্বারা যেন একটি ভাবদেহকে আলিঙ্গন করিতে চাই। হায়! দেহের স্থূলতা দূর হইবে কেমন করিয়া! সে যদি আমার নয়নের আকাঙ্ক্ষায় আলোয় পরিণত হইয়া যাইত, আমার হাত ভরিয়া উঠিবার জন্য যদি সে বাতাস হইয়া যাইত, সমস্ত সত্তা দিয়া পাইবার জন্য সে যদি আকাশ হইয়া যাইত!···

তবু তাহাকে পাইতাম না! কাছের পাওনা দূরের আকাঙ্ক্ষার সহিত বিরোধ করিত। তাহার সেই গভীর চোখের দৃষ্টিতে দূরের পাওনাকে দেখিয়াছি, কিন্তু চক্ষু আসিয়া বাধা দেয়, তাহার অধরের মধুর হাসিতে দূরের পাওনাকে দেখিয়াছি, কিন্তু অধর আসিয়া বাধা দেয়, তাহার রমনীয় হাতের সেবায় দূরের পাওনাকে দেখিয়াছি, কিন্তু হাত আসিয়া বাধা হইয়া দাঁড়ায়। কাছের জিনিস দূরের পাওনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

চক্ষু যেখানে চক্ষুকেই চাহিয়াছে, সেখানে চক্ষু তাহার পথের বাধা দূর

করিয়া দিয়া চক্ষুর সহিত মিলিত হইয়াছে; অধর যেখানে অধরকে চাহিয়াছে, সেখানে একটি পরিপূর্ণ চুম্বনের মধ্যে সকল না পাওয়ার অবসান ঘটিয়াছে; যেখানে বক্ষের 'পরে বক্ষকে চাপিয়া ধরিয়াছি, সেখানে দুইটি হৃৎপিণ্ডের যুগপৎ ধ্বনি বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তাল রাখিয়া ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে না-পাওয়ার বোধ নাই, যৌবনের উদ্দাম বাসনায় সকল দূরত্বকে পরিহার করিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া প্রেয়সীর সিঁথিতে সিঁদুর পরাইয়া দিয়াছি; না-পাওয়ার অশ্রু মিলনের আনন্দাবেগে ঝরিয়া পড়িতেছে।

বিশুর প্রেমে কিন্তু না-পাওয়ার বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশুর প্রেম দূরত্বকে আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছে, বিশুর বেদনা সেই দূরত্বকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছে। বিশুর প্রেমের আলোয় নন্দিনীর তাই আর এক রূপ দেখি; নন্দিনী বিশুর স্বপনতরীর নেয়ে হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রা বলিল, তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু বলিল, বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখনি।

বিশু আপনার প্রেমের ভাবে তাহার জীবনের এই স্বপ্ন-তরী গড়িয়া তুলিয়াছে এবং নন্দিনীকে সেই স্বপনতরীর নেয়ে করিয়া দিয়াছে। প্রেমের নূতন পথে বিশুর যাত্রা হইয়াছে সুরু। বিশু গাহিয়াছে—

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।

বিশুর সকল ভাবনা চিন্তা দূরে রহিল, বিশুর সকল কাজ পড়িয়া রহিল, সেই অনবগুণ্ঠিতা ভাবমূর্তি বিশুকে কোন নিরুদ্দেশের পথে লইয়া চলিল? প্রেমের এই অভিনব অভিসারে বিশু কোথায় গিয়া পৌছিবে, কী তাহার প্রাপ্তি?

কাছের জিনিসকে বিশু চরম বলিয়া মানিয়া লইতে পারে নাই, অথচ দূরের পাওনা এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। ইহারই মূক বেদনা লইয়া যক্ষপুরীর বিকৃত জীবনে বিশু তলাইয়া গিয়াছে। এই বেদনা ভিতরে ভিতরে যক্ষপুরীর মৃত্যুকে বিশুর কাছে রসে পরিণত করিয়া দিয়াছে। এখন বিশুর জীবনে একদিকে "ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,—বলছে কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে,—বলছে, ছুটি ছুটি।" নন্দিনীর প্রতি প্রেমে

যে না-পাওয়ার বোধ, তাহারই বেদনায় বিশু যখন একবার দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার কাছে দুঃখের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। জীবনের মধ্যে দুঃখকে বড়ো করিয়া পাইয়াছে বলিয়াই যক্ষপুরীর বিকৃতি তাহাকে পীড়নের দ্বারা নিষ্পেষিত করিতে পারে নাই, সেই পীড়নকে সে দুঃখের দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছে, মৃত্যু তাহার কাছে রসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে একদিকে মৃত্যুর বেদনা আর একদিকে দূরের পাওনার জন্য দুঃখ বিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে একটি আত্মজাগরণের ভূমি রচনা করিয়া দিতেছিল। এমন সময় নন্দিনী আসিয়া তাহাকে ডাকিল—পাগল ভাই! এই আহ্বানে বিশুর দুঃখের যে সঙ্কোচটুকু ছিল সে সঙ্কোচটুকুও কাটিয়া গেল। বিশু তাহার দুঃখকেই নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিল, বিপদের তলায় তলাইয়া যাইতে চাহিল, বিশুর দুঃখ, বিশুর প্রেম বিশুকে মুক্তির দিকে লইয়া চলিল।

নারী-প্রেম আত্মোপলব্ধির পথে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যে একমাত্র এই বিশুর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেমের চিত্রটি তাই বিশিষ্ট। এই প্রেমের যে ভাষা, তাহার যে সঙ্গীত, তাহাও আর কোথাও বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশুর কথোপকথন হইতে, তাহার গানগুলি হইতে এই যে একটি প্রেমের চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা আমাদের আবিষ্কার মাত্র, আমাদের আরোপিত নহে। নন্দিনীর প্রতি প্রেমে বিশুর মধ্যে একটি আত্মোপলব্ধি ঘটিতেছে, তাহার জীবনে কাছের পাওনা ও দূরের পাওনা লইয়া বিরোধ বাধিয়া গিয়াছে; যক্ষপুরীর জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সেই বিরোধ মনের মধ্যে মৌন হইয়াছিল, কিন্তু নন্দিনীর আবির্ভাবে বিশুর জীবনে আবার নূতন করিয়া প্রেমের অন্তর্নাট্য সুরু হইয়াছে। আমরা এখন বিশুর প্রেমের এই অন্তর্নাট্যটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

নন্দিনী বলিল,—"পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

এই আকাশ হইল প্রেমোপলব্ধির, তথা আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র। জীবনের মধ্যে জীবন যখন প্রেম অনুভব করে, তখন সেখানে এই আকাশ রচিত হইয়া যায়। সেই আকাশে রহিয়াছে ডানা মেলিবার মুক্তি, উড়িবার আনন্দ। জীবন তখন উপলব্ধির গভীরে চলিয়া যায়, কোথাও আসিয়া ঠেকিয়া যায় না। স্বার্থে

আসিয়া ঠেকে না, অহঙ্কারে আসিয়া ঠেকে না, দেহে আসিয়া ঠেকে না। দূরের তারাটি হইতে আলো আসিয়া এই আকাশে তরঙ্গ তোলে, তাহাতেই দূরের পাওনার বেদনা জীবনকে ভরাইয়া রাখে। সেই বেদনায় কি একটা পাইবার জন্য আকৃতি জাগে, স্পষ্ট করিয়া বুঝি না, স্পষ্ট করিয়া তাহা বুঝাইতে পারি না, কিন্তু নয়ন হইতে নিদ্রা চলিয়া যায়, দুঃখটিকে সম্বল করিয়া জীবনের গভীরে অনুসন্ধান করিয়া ফিরি।

কী অনুসন্ধান করি? বলিতে পারি না। প্রশ্ন শুধাইলে হয়তো বলিব, তোমাকে গান শুনাইতে চাই; সেই সঙ্গীতেরই ভাষাকে বুঝিবা খুঁজিয়া ফিরি, তাহারই সুরকে বুঝিবা খুঁজিয়া ফিরি, তাহার বেদনাকে বুঝিবা আস্বাদন করিয়া ফিরি। তবে শুধু এইটুকু জানি যে,—

এল আঁধার ঘিরে,
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া!

শুধু এইটুকু জানি যে,—

আমার কাজের মাঝে মাঝে,
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না-যে।

যে ঘুম ভাঙাইয়াছে, সে-ই দুঃখ জাগাইয়াছে। ঘুম ভাঙা আর দুঃখ জাগা —বিশুর প্রেম-জীবনের একই ঘটনা। বিশু ঘুম ভাঙ্গিয়া দুঃখের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই দুঃখের কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। বিশুর এই দুঃখ হইল প্রেমকে তথা সত্যকে না পাওয়ার দুঃখ—আত্মোপলব্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষার দুঃখ। নন্দিনীর আহ্বানে বিশুর জীবনে নূতন করিয়া এই দুঃখের দরজাটি খুলিয়া গিয়াছে। নন্দিনীর প্রেমে বিশু জীবনের কোন একটি বাণী, কোন একটি সত্য খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

আর এই প্রেমে নন্দিনীকে সে কেমন ভাবে দেখে, নন্দিনীর প্রভাব তাহার উপর কি ভাবে পড়ে?—

আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,

বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

প্রাণটিকে সুধায় ভরিয়া দিবার জন্য যে লঘু স্পর্শটুকুর প্রয়োজন, জীবনকে সেই স্পর্শটুকু দান করিয়া নন্দিনী দূরে সরিয়া যায়। এই স্পর্শটুকু না থাকিলে প্রাণটি সুধায় ভরিত না, দূরে সরিয়া না যাইলে, দূরত্ব রচিত না হইলে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রটি রচিত হইত না, গানটি জাগিত না। এইরূপে নারীর মধ্যে পঙ্কটুকু সরিয়া গিয়া পঙ্কজটুকু কুসুমিত হইয়া উঠে, পুরুষের বাসনাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে বেদনার অধীন করিয়া ফেলে, সেই বেদনার আড়াল রচনা করিয়া যাহা স্থূল ছিল, যাহা ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয় ছিল, তাহাই ভাবের প্রেরণা হইয়া দাঁড়ায়, অন্যতর কি এক না-পাওয়ার দুঃখ জীবনে জাগাইয়া তোলে।

এই ব্যথার আড়াল রচনা করিয়া নন্দিনী,—বিশুর 'স্বপন তরীর নেয়ে,' বিশুকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? বিশুর জীবনে কি কোন একটি প্রাপ্তির বোধ জাগিয়া উঠে নাই, বিশুর বেদনা কি বিশুকে কোন একটি কূলে পৌছাইয়া দিল না?

বিশু গাহিয়াছে—

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে
হ'ল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।

বিশুর প্রেমে প্রাপ্তির একটি গভীরতর মর্মবেদনা রহিয়াছে। এই প্রাপ্তিকে কেমন করিয়া বুঝা যায়? তাহাকে তো ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, তবে তাহাকে ঘিরিয়া কোন প্রাপ্তির কথা জাগিয়া উঠে? তাহার নিকট হইতে যখন বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, সব চাওয়া-পাওয়া বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অশ্রুতে যে জীবনের পেয়ালাটি ভরিয়া উঠিল, চোখের জলের জোয়ারে জীবনের নদী ভরিয়া উঠিয়া এপারের সহিত ওপারের যেন একটি যোগ হইয়া গেল। এই অশ্রুতে তাই জীবনের ওপারের সংবাদ পাইলাম। এতদিন ওপারের কোন খবর জানিতাম না, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না, তাহার কোন বাণী পাই নাই। এখন অশ্রুর জোয়ার আসিয়া এপারের এবং ওপারের মাঝের শূন্যতাকে ভরাইয়া তুলিল। ওপারের বাণী বেদনার ঢেউ তুলিয়া এপারে আসিতে লাগিল, এপারের বালুতটে তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া তাহার আকৃতিকে ওপারের দিকে পাঠাইয়া দিল। এইরূপে এপারে এবং ওপারে একটা কানাকানি হইয়া গেল।

বুঝিলাম ওপার বলিয়া জীবনের একটি গম্য স্থান আছে, সেখানে বুঝি কিছু একটা প্রাপ্তি আছে।

সেই ওপারে গিয়া বিশু কাহাকে পাইবে? সে কি নন্দিনী? না, নন্দিনী নয়। নন্দিনী সেই অগমপারের দূতী মাত্র, স্বপনতরীর নেয়ে মাত্র, কোথাও একটা কূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বিশুর বেদনার হালটি ধরিয়াছে মাত্র; কিন্তু নন্দিনী সেই প্রাপ্তির বিষয় নহে। নন্দিনী রহিবে বেদনার অন্তরালে অশ্রুকে নিত্য জাগাইবার জন্য, রহিবে আকাশের চাঁদ হইয়া জীবনের নদীতে জোয়ার তুলিবার জন্য, রহিবে স্বপনতরীর নেয়ে হইয়া সুদূর ঘাটে জীবনের তরীকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। তাই নন্দিনী বিশুর প্রেমের আধার মাত্র, উপলক্ষ্য মাত্র, বিশুর প্রেমের প্রাপ্তির স্বরূপ নয়। মানবী বা 'রক্তকরবী' হইয়া তো নহেই, এমন কি স্বপনতরীর নেয়ে হইয়াও নয়। যে-নন্দিনী 'রক্তকরবী' হইয়া বিশুকে প্রেরণা যোগাইতে পারে নাই, সেই নন্দিনী 'দুখজাগানিয়া' হইয়া বিশুকে জীবনের নূতন পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। এই যাত্রার শেষে বিশু কোন একটি কূলে গিয়া পৌঁছিবে; তাই 'স্বপনতরীর নেয়ে'কে লইয়া বিশুর জীবনের যে নাট্যলীলা, তাহা বিশুর প্রেম-জীবনের একটি অন্তর্বর্তী অবস্থা মাত্র, ইহা বিশুর প্রেম-জীবনের পরিণাম নহে।—

আমার তরী ছিল চেনার কূলে,
বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে।

এই যে হাওয়ায় হাওয়ায় জীবনের তরী কোন অকূলের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার আনন্দ-বেদনাকে কেমন করিয়া বিশু বুঝাইবে! ধন চাহি না, মান চাহি না, সুখ চাহি না—সেই গভীর চোখের দৃষ্টিতে যে আলো দেখিয়াছি, সেই দূরের আলোকে পাইব কেমন করিয়া! সকলের অগোচরে এই যে একটি মূক বেদনা জীবনের শিকড়ে শিকড়ে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কোন্ বস্তু আনিয়া দিবে যাহাকে পাইলে জীবন চরিতার্থ হইয়া উঠিবে? সেই বেদনা জীবনের মর্মমূলে অত্যন্ত সত্য হইয়া, অত্যন্ত ধ্রুব হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, জীবনের অন্য কোন প্রকার চরিতার্থতাকে চরিতার্থতা বলিয়া স্বীকার করি না। সর্দারের স্বর্ণপুরীর জ্যোতি নয়ন সম্মুখে কোন মোহই বিস্তার করিতে পারে না। সব তুচ্ছ, সব সামান্য;

তাই জীবনের যে-ঘাটে সবাই পার হইয়া গেল, সেই ঘাটে আসিয়া তরী ভিড়িল না।

পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে
আমি সে কোন আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।
সেই পথহারানোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।*

নন্দিনী বলিল, 'পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।'

বিশু—তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আঁখি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রী করব না।

নন্দিনী কি বিশুর পাওনাকে দূরের পাওনা বলিয়া বুঝিয়াছে? নন্দিনীর যাহা দিবার আছে, তাহা তো কাছের জিনিস। বিশুর কাছে তাহা তো অল্প-কিছু। নারীর নিকট হইতে, তথা নন্দিনীর নিকট হইতে বিশু তো এই 'অল্প-কিছু' চাহে নাই। বিশুর প্রেমের বেদনায় নন্দিনী আজ বুঝিয়াছে বিশুর অনেক কিছু দাবী করিবার ছিল, কিন্তু সে দাবী পূরণের শক্তি নন্দিনীর নাই। কিন্তু তাহার কারণ কি, বিশুর দাবীকে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে বলিয়া, না রঞ্জনের সহিত সে পরিণীতা বলিয়া। বিশুর প্রেমের যে বিকাশ ঘটিয়াছে, নন্দিনীর প্রেমের সে বিকাশ ঘটে নাই। পুরুষের কাছে নন্দিনীর যাহা দেয়, তাহা হইল রক্তকরবীর রঙে রাঙা প্রেম; নন্দিনী তাহা আনিয়াছে রঞ্জনের জন্য। অথচ বিশুর এই গভীর প্রেম লাভ করিয়া তাহাকেও কিছু ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আর তো কিছু নন্দিনীর দিবার নাই। রঞ্জনের প্রেমের রঙ্ রাঙা; বিশুর প্রেমের রঙ্—বোধহয় নীল; সে রঙের সহিত নন্দিনীর প্রেমের রঙ্ মিলিবে কেমন করিয়া। নন্দিনীর প্রেমের এই সীমাটিকে রক্ষা করিয়া কবি নন্দিনীকে স্বাভাবিক করিয়া আঁকিয়াছেন, নতুবা নন্দিনীর প্রেমের আরও কোন গভীরতর বিকাশ দেখাইলে চরিত্রটি অস্বাভাবিক এবং অমানবিক হইয়া পড়িত।

বাজি খেলার ভিড় হইতে একদিন শূন্য হাতে যে বিদায় লইয়াছিল, সে যখন বহুদিন পরে তাহার সঙ্গীতের নৈবেদ্য লইয়া মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,

* গানের এই অংশটুকু নাটকের প্রয়োজনে বর্জিত হইয়াছে

তখন নন্দিনী স্বীকার করিল যে, তাহার পাওনা মিটাইবার শক্তি নন্দিনীর নাই। নন্দিনীর এই স্বীকৃতিতে নন্দিনীর নারীত্বের স্থূল অহঙ্কারটি চলিয়া গিয়াছে। আজ নন্দিনী বিশুর প্রেমের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে।

নন্দিনীর এই স্বীকৃতি বিশুর মধ্যে প্রেমের একটি অভিমান, দুঃখের একটি গৌরববোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে। কাছের পাওনা ও দূরের পাওনার ভেদটিকে বিশু স্পষ্ট করিয়া দেখে বলিয়া, এখনও তাহার দ্বন্দ্ব রহিয়াছে বলিয়া, বিশু দূরের পাওনাকে এবং আপনার সঙ্গীতের মূল্যকে বড়ো করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

বিশুর প্রেম-জীবনের চিত্রটিকে আমরা দেখিলাম; তাহার দ্বন্দ্বের রূপটি বুঝিলাম এবং এই প্রেম হইতে বিশুর যে দুঃখ জাগিয়াছে সেই দুঃখটিকেও আমরা চিনিলাম। বিশুর এই মহান্ দুঃখকে কবি রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হইতে দেন নাই, তাহাকে দিয়া ফসল ফলাইয়াছেন।

সর্দার আসিয়া বিশুকে জিজ্ঞাসা করিল—কী নিয়ে আলাপ চলছে।

বিশু। তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার। বল কী, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

বিশু। সর্দার, মনে-মনে তো সব জানই। খাঁচার পাখী সলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর ক'রে নয়। এ কথা কবুল করলেই বা কী, না-করলেই কী।

সর্দার। আদর করে না, সে জানা আছে; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েকদিন থেকে জানান দিচ্ছে।

বিশুর মধ্য হইতে ক্রমশঃই ভয় কাটিয়া যাইতেছে। বিশুর আত্মোপলব্ধি যতই গভীর হইতেছে, জীবনের সত্যকে বিশু ততই আবিষ্কার করিতেছে। এতদিন যক্ষপুরীর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে মনের মধ্যে একটা বিরোধিতা পোষণ করিয়া চলিতেছিল, আজ কিন্তু নন্দিনীকে স্মরণ করিয়া তাহার মন স্পর্ধিত হইয়া উঠে, সাবধান হইতে তাহার ঘৃণা বোধ হয়। আজ সে বুঝিয়াছে সত্যের মধ্যেই আছে জীবনের মুক্তি। নানা তুচ্ছ কাছের পাওনার জন্য এই সত্যকে আমরা জীবনে এড়াইয়া চলি, দূরের পাওনার বোধ হইতে এই সত্যের প্রতি আকর্ষণ জাগিয়া উঠে। এই সত্যকে লাভই জীবনের পরম লাভ, কারণ সত্য আর কিছুই নয়, ইহাই হইল সকল বিকৃতির ঊর্ধ্বে আনন্দময় সহজ জীবন।

নন্দিনীর প্রতি প্রেমে এই সত্যের ঘাটে আসিয়া বিশুর জীবনের তরী ভিড়িয়াছে।

বিশু বলিল—পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হ'ল।

নন্দিনী। কি বলছ বুঝতে পারছিনে।

বিশু। যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী। কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলাম।

নন্দিনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশু। কিচ্ছু না।

নন্দিনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশু। এতেই বা ক্ষতি কী হ'ল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি—এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

এই যে 'সত্যের মধ্যে মুক্তি' ইহাই বিশুর দূরের পাওনা। এই মুক্তিকে তো বাহিরে দেখাইবার উপায় নাই, ইহা অন্তরে অনুভব করিবার বিষয়। তবে অসত্যের সহিত ইহার যখন সংগ্রাম হয় তখনই ইহার জ্যোতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রহরীর বন্ধনের মধ্য দিয়া মুক্তির সেই জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে।

বিশুর গায়ে চাবুকের দাগ, প্রহরীরা তাহাকে পশুর মতন বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে; তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে বুঝি ফাঁকির বোঝা লইয়া চলিয়া গেল। নন্দিনী পর্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছে,—"এ কথা কোনদিন ভুলতে পারব না যে তোমাকে শূন্য হাতে বিদায় দিয়েছি।" কিন্তু সেই পাগল তাহার পাওয়ার গান গাহিয়া উঠিল—

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি,
বাকী যা নয় গো নেবার মাটিতে হ'ক তা মাটি।

এই শেষ ফলনের ফসল হইল সত্যের মধ্যে মুক্তি। ইহাই হইল উত্তম আনন্দ। পাগল অর্থে আনন্দবাদী। এই উত্তম আনন্দকে চাহিয়াছে বলিয়াই বিশুকে বলি পাগল।

দুঃখই জীবনের শেষ কথা নয়; দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দ রহিয়াছে। দুঃখ এই আনন্দের কাছে আমাদিগকে আনিয়া দেয়। "দুঃখেরই পরিণাম

আনন্দ, মুক্তি, ঈশ্বর।" দুঃখের মধ্য দিয়া বিশু আনন্দকে পাইয়াছে, মুক্তিকে পাইয়াছে; ঈশ্বরকে পাইয়াছে কি? বিশু ঈশ্বরকে একবার স্মরণ করিয়াছে, ঈশ্বরকে পাইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু বিশু গাহিয়াছে—

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁটি
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক তা মাটি।

যখন আনন্দের ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিয়াছি, তখন কোন জিনিসকে বাহিরে রাখিব, কোন জিনিস আপনি বাদ পড়িয়া গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া মাটি হইয়া যাইবে?

বিশুর যে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা নারী-প্রেমের মধ্য দিয়া মুক্তি, যক্ষপুরীর বিকৃতির নানা পীড়নের মধ্য দিয়া মুক্তি। ইহাতে বিশুর জীবনে বেদনার বিচিত্র সঞ্চয় জমা হইয়াছে। বেদনার সঞ্চয়গুলির প্রতি আমাদের একটি আসক্তি থাকে। সেই বেদনার সঞ্চয়গুলিকেও ক্ষয় করিয়া আসিতে হইবে তাহা হইলে বেদনা আর আনন্দের আবরণ হইয়া থাকিবে না।

বেদনার সেই সঞ্চয়গুলিকে বিশু মুক্তির আনন্দে তুচ্ছ করিয়াছে। তাই বিশুর আর অভিমান নাই, তাই বিশু নন্দিনীর ফেলিয়া যাওয়া মালাটি হাতে তুলিয়া লইয়া বলিয়াছে—"তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হ'ল, তার শেষ দান।"

প্রেমের মধ্যে যখন সত্যকে পাই না তখন দূরের পাওনা ও কাছের পাওনায় বিরোধ জাগে। যখন সত্যকে পাই তখন এই বিরোধ ঘুচিয়া যায়; তখন রক্তকরবীর রক্তিমাকেও স্বীকার করি, দুখ-জাগানিয়ার আনন্দ-বেদনাকেও বরণ করি। তখন দূরের তারার আলোটি কাছে আসিয়া যায়, তখন চতুর্দিকেই আলোক-দর্শন ঘটে। তখন প্রেমের মধ্যে সত্যকে পাইয়া মুক্তি লাভ করি।

বিশু বলিয়াছে,—'এবার সুরু হল একলা মহাযাত্রার'। এখন আমরা তাহার কথাটি বুঝিতে পারি। জীবনের পথে আমাদের একাকীই তো চলিতে হয়। সঙ্গী যে খুঁজি সে শুধু একাকিত্বকে আস্বাদন করিবার জন্য, আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য। এই সঙ্গী খুঁজিতেই তো যত বিরোধ। সঙ্গী আর কেহ নাই, সঙ্গী হইল প্রেম, সঙ্গী হইল সত্য। প্রেমকে,

সত্যকে যখন সঙ্গী করিয়া পাই, জীবনের পথে একলা যাত্রাটি তখন আর দুঃসহ হইয়া উঠে না, তখন সেই একলা যাত্রাটি অনাদি কালের অভিমুখে অনাদি কালের অভিসার হইয়া উঠে।

পথিক পাগলের সেই প্রেমাভিসারের ধ্যান-রূপটির দিকে চাহিয়া আমরা এইখানে বিশুর প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

—